মতি মিয়া দ্রুত পায়ে হাঁটছিল।

আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সঙ্গে ছাতা ফাতা কিছুই নেই। বৃষ্টি নামলে ভিজে ন্যাতা ন্যাতা হতে হবে। মতি মিয়া হন হন করে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে সোহাগীর পথ ধরল। আর তখনি বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না। সকাল সকাল বাড়ি ফেরা দরকার। শরিফার পা ফুলে ঢোল হয়েছে। কাল সারারাত কোঁ কোঁ করে কাউকে ঘুমাতে দেয়নি। সন্ধ্যার পর আমিন ডাক্তারের এসে দেখে যাবার কথা। এসে হয়তো বসে আছে। মতি মিয়া পাশের একটা ঝাকড়া জাম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ঢালা বর্ষণ, জামগাছের ঘন পাতাতেও আর বৃষ্টি আটকাচ্ছে না। দমকা বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। দিনের যা গতিক, ঝড় তুফান শুরু হওয়া বিচিত্র না। দাঁড়িয়ে থেকে কোনো অর্থ হয় না। মতি মিয়া উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তায় নেমে পড়ল। পা চালিয়ে হাঁটা যায় না। বাতাস উল্টো দিকে উড়িয়ে নিতে চায়। নতুন পানি পেয়ে পথ হয়েছে দারুণ পিছল। ক্ষণে ক্ষণে পা হড়কাচ্ছে। সরকারবাড়ির কাছাকাছি আসতেই খুব কাছে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। আর আশ্চর্য বৃষ্টি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মতি মিয়া অবাক হয়ে শুনল সরকারবাড়িতে গান হচ্ছে। কানা নিবারণের গলা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে,

"আগে চলে দাসী বান্দি পিছে ছুকিনা,
তাহার মুখটি না দেখিলে প্রাণে বাঁচতাম না
ও মনা ও মনা ..."

সরকারবাড়ির বাংলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। মতি মিয়া ধাক্কা দিতেই নাজিম সরকার মহাবিরক্ত হয়ে দরজা খুললেন। হাঁ, কানা নিবারণই গাইছে। সেই গাট্টা গোট্টা চেহারা, পান খাওয়া হলুদ রঙের বড় বড় কুৎসিত দাঁত। কানা নিবারণ গান থামিয়ে হাসি মুখে বলল, মতি ভাই না? পেন্নাম হই। অনেকদিন পরে দেখলাম।

মতি মিয়া বড়ই অবাক হলো। কানা নিবারণের মতো লোক তার নাম মনে রেখেছে। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। কানা নিবারণ গম্ভীর হয়ে বলল, মতি ভাইরে একটা গামছা টাগছা দেন।

কেউ গা করল না। নাজিম সরকার রাগী গলায় বললেন, ভিজা কাপড়ে ভিতরে আসলা যে মতি? দেখ ঘরের অবস্থা কি করছ? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর হইল না, ছিঃ ছিঃ।

কানা নিবারণ বলল, ঘরে না আইস্যা উপায় কি? বাইরে ঝড় তুফান।

নাজিম বড়ই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। থেমে থেমে বললেন, 'তুমি গান বন্ধ করলা কেন নিবারণ?'

কানা নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করল,

"দুধের বরণ সাদা সাদা কালা নিখিল রূপ
তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল।"

মনটা উদাস হয়ে গেল মতি মিয়ার। শরিফা বা আমিন ডাক্তার কারোর কথাই মনে রইল না। কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগল। আহ্, এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কি করে গায়? কি গলা!

গান থামল অনেক রাতে। ততক্ষণে মেঘ কেটে আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতায় চক চক করছে জোছনা। মতি মিয়া উঠানে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জোছনা এমন অদ্ভুত লাগে। বিড়ি টানতে টানতে নিবারণ বাইরে আসতেই মতি মিয়া বলল, কেমন চাঁদনি রাইত দেখছেননি নিবারণ ভাই?

'চাঁদনি রাইত' নিবারণকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। বিড়িতে টান দিয়ে সে প্রচুর কাশতে লাগল। কাশির বেগ কমে আসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িত যান মতি ভাই, রাইত মেলা হইছে।

আর 'গাওনা' হইত না?

নাহ্ আইজ শেষ। এখন বেশি গাই না। বুকের মধ্যে দরদ হয়।

ডাক্তার দেখান নিবারণ ভাই।

নিবারণ বিরক্ত মুখে এক দলা থুথু ফেলে, চোখ কুঁচকে বলল, বাড়িতে যান। আমার ডাক্তার লাগে না।

রাস্তায় নেমেই মতি মিয়া লক্ষ করল আবার মেঘ করেছে।

দক্ষিণ দিকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দুই পহরের শেয়াল ডাকল। এতটা রাত হয়েছে না কি? চারদিক নিস্তব্ধ। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়ায় ঘুটঘুটি অন্ধকার। গা ছমছম করে।

কেডা? মতি নাকি?

মতি মিয়া চমকে দেখে ছোট চৌধুরী। উঠানে জলচৌকি পেতে খালি গায়ে বসে আছেন। ইনার মাথা পুরোপুরি খারাপ। গত বৎসর কৈবর্ত পাড়ার একটা ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

কে একটা কথা কয় না যে? মতি না কি?

জি।

এত রাইতে কই যাও?

বাড়িত যাই।

তোমার বড় পুলাডা তোমারে খুঁজতেছে। তোমার বৌয়ের অবস্থা বেশি ভালো না। নীলগঞ্জে নেওন লাগবো।

জি আচ্ছা।

জি জি করো। কেন মতি মিয়া? তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।

মতি মিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট চৌধুরীর অভ্যাস হচ্ছে ভালো মানুষের মতো কথা বলে হঠাৎ তাড়া করা। সে কারণেই চট করে সামনে থেকে চলে যেতে ভরসা হয় না।

ছোট চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন।

কথা কানে ঢোকে না? থাপ্পড় দিব, ছোট লোক কোথাকার। যা বাড়িত যা।

মতি মিয়া বাড়ি ফিরে দেখে আমিন ডাক্তার বসে আছে। শরিফার জ্ঞান নেই। আজরফ চুলা ধরিয়ে কি যেন জ্বাল দিচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বলল, অবস্থা বড় সঙ্গিন। রাইত কাটে কি না সন্দেহ।

মতি মিয়া কিছু বলল না। যেন সে আমিন ডাক্তারকে দেখতেই পায়নি। আজরফের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দেয়, অত রাইতে কি জ্বাল দেস?

চা। আমিন চাচা চায়ের পাতা আনছে।

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, সারা রাইত জাগন লাগবো, চা ছাড়া জুইত হইত না। বুঝছনি মতি নীলগঞ্জ নেওন লাগবো।

আমিন ডাক্তার লোকটি ভীতু প্রকৃতির। রুগীর অবস্থা একটুখানি খারাপ দেখলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নীলগঞ্জ নেবার জন্যে, ধারধার বলে, রাইত কাটা সম্ভব না। রাইতের মধ্যেই ভালো মন্দ হইতে পারে।

কিন্তু আজ রুগীর অবস্থা সত্যি খারাপ। আমিন ডাক্তার চিন্তিত মুখে ক্রমাগত হুঁকা টানে। মতি মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, মেয়ে-মানুষের মতো বেআক্কেল জিনিস খোদার দুনিয়া-নাই, বুঝলা ডাক্তার?

ডাক্তার হুঁকা টানা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বলে, নীলগঞ্জ নেওনের ব্যবস্থা করো মতি।

কইলেই তো ব্যবস্থা হয় না। যোগাড়-যন্ত্র লাগে। সকাল হউক। টেকা-পয়সার যোগাড় দেখি।

'আইজ রাইতেই নেওন লাগবো মতি।'

মতি মিয়া কথা না বলে খেতে বসে। আজরফ ভাত বেড়ে দেয়। ভাত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কাঁচা মরিচে ঝালের বংশ নাই। মতি মিয়া আধপেটা খেয়েই হাত ধোয়। ছোট ছেলে নুরুদ্দীন জামিল চক্ষুলজ্জা না রেখে বসেছিল। সে দীর্ঘ সময় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে বলে ফেলে, আমারে নীলগঞ্জ নেওন লাগবো বাজান।

বহু কষ্টে রাগ সামলায় মতি মিয়া। আমিন ডাক্তার বলে, চা খাও একটু মতি। আজরফ তর বাপরে চা দে।

আমারে দিস না।

আরে খাও। ভালা চা। মোহনগঞ্জের খরিদ।

নীলগঞ্জ যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র করতে অনেক সময় লাগে। বাঁশের যে খুঁটিতে পয়সা

জমান হতো সেটি কাটা হয়। সব মিলিয়ে সাত টাকার মতো পাওয়া যায় সেখানে। এতটা মতি মিয়া আশা করেনি। আজরফ চলে যায় নৌকার ব্যবস্থা করতে। ঠিক হয় আজরফ নুরুদ্দীন দু'জনেই সঙ্গে যাবে। আমিন ডাক্তারও যাচ্ছে। নীলগঞ্জ হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার সাহেবের সঙ্গে তার নাকি ভালো জানাশোনা। আপনি আপনি কথা বলে।

খালি বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে আনা হয়েছে রহিমাকে। রহিমার মেয়েটি কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। শরিফার জ্ঞান ফিরেছে। সে বিড় বিড় করে কি যেন বলে ঠিক বুঝা যায় না। মতি মিয়া কড়া ধমক লাগায়, চুপ। একদম চুপ। বেআক্কেল মেয়ে মানুষ।

শরিফা চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার এক ফাঁকে বলে, আমারে যে সাথে নিতাছ সেই বাবদ দুই টেকা ভিজিট, কথাডা স্মরণ রাখবা মতি।

মতি মিয়া দারুণ বিরক্ত হয়।

তোমারে সাথে নেওনের কথা তো কই নাই। নিজের ইচ্ছায় তুমি যাইতাছ।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়।

নৌকায় উঠবার মুখে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। ছইয়ের নিচে খড় বিছিয়ে শরিফার বিছানা। শরিফার গায়ের সঙ্গে সেঁটে লেগে থাকে নুরুদ্দীন। ডাক্তার বসেছে নৌকার সামনের মাথায়। এর মধ্যেই সে ভিজে চুপসে গেছে। তার সঙ্গে ছাতা আছে। কিন্তু রুগী নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় ছাতা মেলতে হয় না। খুব অলক্ষণ। নৌকাতে দু'টি মুরগি এবং একটি পাকা কাঁঠাল নেওয়া হয়েছে। নীলগঞ্জ বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

মুরগি দু'টি অনবরত ডানা ঝাপটায়। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে হুঁকা ধরায়। বৃষ্টির ছাট থেকে কল্কে আড়াল করে রাখতে তাকে অনেক কায়দা কানুন করতে হয়। পাকা কাঁঠালের গন্ধের সঙ্গে তামাকের গন্ধ মিশে অদ্ভুত একটা মিশ্র গন্ধ তৈরি হয়। তুমুল বর্ষণের মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে দেয়া হয়। আজরফ টপাটপ বৈঠা মারে। মতি মিয়ার বড় মায়া লাগে।

শীত লাগে আজরফ?

না।

মাথাডা গামছা দিয়া বাঁধ। মাথা শুকনা থাকলে সব ঠিক ঠাক। বুঝছস?

বুঝছি।

বৈশাখ মাসের বিষ্টির মজাটা কি জানসনি আজরফ?

না।

মজাটা-এইল অসুখ বিসুখ হয় না। সব আল্লাহর কেরামতি।

আজরফ কথা বলে না। ছৈয়ের ভেতর থেকে শরিফা বিড়বিড় করে কি যেন বলে। অসহ্য বোধ হয় মতি মিয়ার।

কি কও?

পুলাডা ভিজতাছে।

দুধের মেয়ে মানুষ। বিষ্টির সময় ভিজত না?

অসুখ করব।

চুপ থাক মাগী, খালি প্যানপ্যানানি।

আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়ে জাতের সাথে এই সব গালি-গালাজ করা ঠিক না মতি।

তুমি খব-কর কইয়ো না, চুপ থাক।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে। ছৈয়ের ভেতর থেকে মুরগি দু'টির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসে। দূরের সোনাদিয়ার হাওরের দিকে থেকে হুম হুম শব্দ হয়। পা হুম হুম করে আজহারের। নৌকা এখন বড় গাঙে পড়বে। জায়গাটা খারাপ। গাঙের মুখটাতেই তিনটি প্রকাণ্ড শ্যাওড়া গাছ। রাতে নাম নেওয়া যায় না এমন সব বিদেশী জিনিসদের খুব আনাগোনা।

নৌকা নীলগঞ্জে পৌঁছল দুপুরের পর। মতি মিয়ার নড়বার শক্তি নেই। এক নাগাড়ে নৌকা বেয়ে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার চিন্তা ছাড়া তার মাথায় এখন আর কিছু ঢুকছে না। আমিন ডাক্তার একাই গেল হাসপাতালে খোঁজ নিতে। ঘণ্টাখানিক পর ফিরে আসল মুখ কালো করে। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব গেছেন ছুটিতে। কখন আসবেন কেউ জানে না। কম্পাউন্ডার সাহেবের মেয়ের বিয়ে। তিনি গেছেন বাপবাড়ি। বিষ্যুদবার নাগাদ আসবার কথা। মতি মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে গম্ভীর মুখে বলল, চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করি নাই, কি কও ডাক্তার? কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। করনের তো কিছু নাই।

আমিন ডাক্তার চুপ করে থাকল। মতি মিয়া বলল, খাওয়া খাইয়া শেষ কইরা চল বাড়িত যাই।

মতি ভাই চল মিশনারী হাসপাতালে লইয়া যাই। বেশি দূর না, একটা মুটে হাওর পরে। সোনাদিয়া হাওর।

আমিন ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মতি মিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, এইসব কিরিস্তানির মইধ্যে আমি নাই। এইসব কথা মুখে আইন্যা না বুঝলা।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। শরিফার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। জারুল গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে ভর পেট চিড়া খেয়ে মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার পর। নৌকা তখন সোনাদিয়ার হাওরে পড়েছে। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। পাল খাটানো হয়েছে। আমিন ডাক্তার হাল ধরে বসে আছে। ভাব খানা এরকম যেন কিছুই জানে না।

মতি ভাই, বাতাসের এই ধরনের জোর থাকলে এক পহরেই মিশনারি হাসপাতালে পৌঁছান যাইবে।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে।

তামুক খাইবা নাকি, কি ও মতি ভাই।

নাহ।

মিশনারি হাসপাতালে একবার নিয়া ফেলতে পারলে বুঝলা আর চিন্তা নাই। হেই খানে নিখন সাব ডাক্তার খুব এলেমদার লোক।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে। আড় চোখে দেখে আবেরক কাল রাতের পরিশ্রমে কাহিল হয়ে মরার মতো ঘুমাচ্ছে। শরিফার মুখের কাছে ভনভন করে মাছি উড়ছে একটা। মরে গেছে না কি? মরলেই কি আর বেঁচে থাকলেই কি? হাওরের দিগন্ত বিস্তৃত কালো পানির দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায় তার। জগৎ সংসার তুচ্ছ বোধ হয়, সে চাপা স্বরে গুনগুন করে,

"লোকে আমায় মন্দ বলে রে
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে
আমি কোথায় যাব কি করিব
দুঃখের কথা কাহারে কব রে।
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে।"

আমিন ডাক্তার মৃদুস্বরে বলে, তুমি কিন্তু বড় গায়ক মতি ভাই।

২

মতি মিয়া পাঁচ দিন পর ময়নার নৌকায় ফিরে এল।

সঙ্গে নুরুদ্দীন। নিখন সাব ওরফে (রিচার্ড এ্যান্ডারসন নিকলসন) বলেছেন সারাতে সময় নেবে। অবস্থা ভালো না। কাটাকুটি করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাস খানেক লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমিন ডাক্তারের নাকি তেমন কাজকর্ম নেই। সে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে আসবে। মতি মিয়া অবাক হয়ে বলেছে, এক মাস যদি থাকন লাগে তুমি খাইবা কি?

হইব একটা ব্যবস্থা। রুগী ফালাইয়া তো যাওন যায় না।

ব্যবস্থা যে কি হবে মতি মিয়ার মাথায় আসে না। আমিন ডাক্তারের কাছে আছে সর্বমোট সাড়ে ন' টাকা। কিন্তু আমিন ডাক্তারকে মোটেই চিন্তিত মনে হয় না। আজরফকে অনশ্যি নিখন সাব বাসায় কাজ দিয়েছেন। নদী থেকে সে গোসলের পানি তুলে আনে। বিকালে হাসপাতালের মেঝে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। যত ঘসাঘসিই করা হোক সাহেবের পছন্দ হয় না। মাথা নেড়ে বলেন, 'আরো ভালো করো। জোরে ব্রাশ করো।'

খাওয়া দাওয়া সাহেবের এখানেই হয়। সে খাওয়াও রাজ রাজড়ার খাওয়া। সকাল বেলা পাউরুটি, চিনি, একটা কলা আর এক কাপ দুধ। সন্ধ্যাবেলা বই খাতা নিয়ে বসতে

তা। কালো মোটা মতো একজন মহিলা অনেককে বর্ণ পরিচয় শেখান। একটি শক্ত বোর্ডে সাদায় একটা 'অ' লিখে সুরেলা স্বরে বলেন, "বল অ"। সবাই সমস্বরে বলে 'অ'। "বল আ"...।

আজরফের খুব মজা লাগে। পড়া শেষ হবার পর হয় প্রার্থনা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত করুণ সুরে টেনে টেনে বলেন,

"হে পরম করুণাময় ঈশ্বর।

তুমি তোমার মঙ্গলময় করুণার হস্ত প্রসারিত কর।...

প্রার্থনার জায়গায় আসলেই আজরফের ভয় ভয় করে। কে জানে এরা হয়তো 'খিরিস্তান' করে ফেলেছে। আমিন ডাক্তার অবশ্যি বলেছে ভয়ের কিছু না। খিরিস্তানি বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে মনে মনে কলেমা তৈয়ব পড়লেই সব দোষ কাটা যাবে। আমিন ডাক্তারের মতো জ্ঞানী লোককে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। আজরফের আর ভয় টয় করে না। ভয় করে মতি মিয়ার ; কোনো কারণ ছাড়াই ভয় করে।

নৌকা ছেড়ে নড়তে চায় না। আমিন ডাক্তারের ঠেলা-ঠেলিতে শরিফাকে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড! হাসপাতালের বারান্দায় মুখ ভর্তি করে বমি করে। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলে, হইলো কি তোমার মতি ভাই?

বদ গন্ধ। মাথার মধ্যে পাক দেয়।

তোমারে নিয়া মুশকিল। এইটা তো ফিনাইলের গন্ধ।

কিসের গন্ধ?

ফিনাইল। এক কিসিমের সাবান। খুব ভালো জিনিস।

ভালো জিনিস হাতের থাকুক। মতি মিয়া বাড়ি ফিরে বাঁচে, নুরুদ্দীন বাপের সঙ্গে ফিরে যেতে কোনো আপত্তি করে না। মতি মিয়া বার বার জিজ্ঞেস করে, মায় লাগি মন কান্দেনি নুরু?

নাহ্।

দুই দিন পরেই দেখবি আইয়া পড়ছে।

আইচ্ছা।

খুব বেশি হইলে এক হপ্তা। এর বেশি না।

আইচ্ছা।

যাত্রা দেখতে চাস? মোহনগঞ্জে যাত্রা আইছে। বিবেকের পাঠ করে আসলাম মিয়া। কাটা সোনার মেডেল। দেখবি?

নাহ্।

না বললেও মতি মিয়া এক রাত মোহনগঞ্জে থেকে যায়। এত কাছে এসে আসলাম মিয়ার বিবেকের গান না শুনা পাপের সামিল। নিত্যি দিন তো আর এমন সুযোগ হয় না? মোহনগঞ্জ বাজারে দেখা হয়ে যায় অমনা নিবারণের সাথে। সেও খুব মহৎ

আসলামের গান শুনতে এসেছে। সে একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনে বসে ছিল। তার মুখ দিয়ে ভক ভক করে দেশি মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ও নুরা দেখছস? হই দেখ কানা নিবারণ।

কোন জন?

কালামতো যেটা। লম্বা দাবড়ি।

চউখ তো দুইটাই আছে, ইনারে কানা নিবারণ ডাকে ক্যান?

ছেলের কথায় মতি মিয়া বড়ই খুশি হয়। ছেলে চুপচাপ থাকলে কি হবে বুদ্ধি-শুদ্ধি ঠিকই আছে। মতি মিয়া হাসি মুখে বলে, মাইনষের খিয়াল। মাইনষের খিয়ালের কি ঠিক-ঠিকানা আছে? ছেলেকে দাঁড়া করিয়ে মতি মিয়া চলে যায় কানা নিবারণের সামনে।

দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক না।

নিবারণ ভাই, শরিলডা ভালা?

কানা নিবারণ কথা বলে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

চিনছেন আমারে? আমি মতি। সোহাগীর মতি মিয়া।

কানা নিবারণ ঘোলাটে চোখে তাকায়। উত্তর দেয় না।

আসলাম মিয়ার গাওনা শুনতে আইছেননি নিবারণ ভাই?

কানা নিবারণ সে কথার জবাব দেয় না।

বাড়ি ফিরেও নুরুদ্দিন কোনো রকম ঝামেলা করে না। নিজের মনেই থাকে। মতি মিয়া বার বার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি পেট পুড়ে?

নাহ্।

মুখ শুকনা ক্যান? খিদায় পেট পুড়ে?

নাহ্।

মতি মিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে। কিছুতেই মন বসে না। নইম মাঝির বাড়ি সন্ধ্যার পর গান বাজনার আয়োজন হয়। মতি মিয়া রোজ যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সেখানেও শুধুই হাই হাই করে।

সইন্ধ্যাকালে বাড়িত গিয়া করবাটা কি মতি ভাই।

পুলাডা একলা আছে।

হে তো ঘুমাইতেছে। বও দেহি, হুক্কাতাত একটা টান দিয়া হারমুনিডা ধর।

বাড়ি ফিরে তার ভালো লাগে না। কেমন উদাস লাগে। রাতের খাওয়া শেষ হলে এক আধ দিন রহিমার সাথে খানিক গল্পগুজব করে। রহিমা লম্বা ঘোমটা টেনে বারান্দায় বসে। কথা বলার সময় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে। মতি মিয়া তার গ্রাম সম্পর্কে ভাসুর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব না। রহিমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মতি মিয়ার খারাপ লাগে না।

মিয়া সাব কেমন আছেন মতি ভাই?

মতি মিয়ার অসংখ্য বার ইচ্ছা হয়েছে আমিন ডাক্তারকে ডেকে বলে দেয় যাতে সময়ে-অসময়ে এই ভাবে না আসে। কিন্তু কোনো দিন বলা হয় নাই। এটা খুব ছোট কথা। আমিন ডাক্তারের মতো বন্ধু মানুষকে এমন একটা ছোট কথা বলা যায় না।

শরিফাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মতি মিয়া অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। গান বাজনা এখন আর ভালো লাগে না। নিখল সার ডাক্তারের হাসপাতালে চলে গেলে হয়। মেলা খরচের ব্যাপার।

আবার একটু লজ্জা লজ্জাও করে। নুরুদ্দীনকে আড়ালে একবার জিজ্ঞেস করে, ও নুরা মারে আনতে যাইবি?

নাহ্‌।

না কি ব্যাটা? মার লাগি পেট পুড়ে না? কস কি হারামজাদা। মায়া মুহব্বত কিছুই দেহি তর মইধ্যে নাই।

নুরুদ্দীন মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখে মনেই হয় না মায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেছে।

নুরুদ্দীন রহিমার মেয়ে অনুফার সাথে গম্ভীর মুখে সারা দিন খেলাধুলা করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই দেখা যায় নুরুদ্দীন গাঙের পাড়ের একটি জলপাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে অনুফা। দুই জনেই নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে। মতি মিয়া বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছে ব্যাপারটি। একদিন নুরুদ্দীনকে ডেকে ধমকেও দিল, গাছের মধ্যে বইয়া থাকস, বিষয়ডা কি?

নুরুদ্দীন নিরুত্তর।

দুপুর বেলা সময়ডা খারাপ। জ্বিন ভূতের সময়, এই সময় গাছে বইয়া থাকনের দরকার কি?

নুরুদ্দীন চোখ পিট পিট করে। কথা বলে না।

খবরদার আর যাইস না।

আইচ্ছা।

তবু নুরুদ্দীন যায়। জলপাই গাছের নিচু ডালটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আপনমনে কথা বলে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকে অনুফা। ক্ষণে ক্ষণে ফিকফিক করে হাসে। মতি মিয়া ঠিক করে ফেলে নুরুদ্দীনের জন্যে একটা তাবিজ টাবিজের ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষণ ভালো না। রহিমার সঙ্গেও এই নিয়ে সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। মতি মিয়া আড়াল থেকে শুনেছে রহিমার সঙ্গে সে হড়বড় করে অনবরত কথা বলে। রাতের বেলা কাঁথা বালিশ নিয়ে রহিমার সঙ্গে ঘুমোতে যায়। এতটা বাড়াবাড়ি মতি মিয়ার ভালো লাগে না।

রহিমা মেয়েটি অবশ্যই খুবই কাজের। এই কয়দিনেই সে বাড়ির চেহারা পাল্টে ফেলেছে। পুবের ঘরের সামনে আগাছার যে জঙ্গল ছিল তার চিহ্নও নেই। চার পাঁচটা কাগজি লেবুর কলম লাগিয়েছে সারি করে। বাড়ির পেছনের রান্নার জায়গাটা দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ঘাটে যাওয়ার পথটায় সুন্দর করে ইট বসানো। ইটগুলি যোগাড় হয়েছে

কপালগুণে কে জানে মতি মিয়ার ইচ্ছা করে রহিমাকে এই বাড়িতেই রেখে দিতে। শরিফার ঘরের লাগোয়া একটা ছোট মতো চালা ঘর তুলে নিলেই হয়। শরিফা কিন্তু রাজি হবে না। কেঁদে কেটে বাড়ি মাথায় করবে। কারণ রহিমার বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী। একটি সুন্দরী এবং অল্প বয়েসী মেয়েকে জেনে-শুনে কোনো বাড়ির বৌ নিজের বাড়িতে রাখবে না।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে উপস্থিত। তাকে আর চেনার উপায় নেই। গায়ে বড় একটা কটকটে লাল রঙের কোট। কোটটির ঝুল নেমে এসেছে তার হাঁটু পর্যন্ত। চোখে সোনালি রঙের একটি নিকেলের চশমা। কোটটি নিখল সাব আসবার সময় দিয়েছেন। চশমাটি হাসপাতালে খুঁজে পাওয়া। চশমায় সব জিনিস কেমন ঘোলা ঘোলাটে দেখায়। কোটের সঙ্গে চশমা না থাকলে মানায় না বলেই গ্রামে ঢুকবার মুখে আমিন ডাক্তার চোখে চশমা দিয়ে নিয়েছে।

মতি মিয়া নইম মাঝির ঘরে তাস খেলছিল। খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এর মধ্যে আশেপাশের দু'এক ঘরের মেয়েছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে। নুরুদ্দীন কাঁচা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে আছে।

শরিফা ঘরের ভেতরে চৌকির উপর বসেছিল। মতি মিয়াকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন কোনো কারণে লজ্জা পাচ্ছে। মতি মিয়া অবাক হয়ে দেখল শরিফার গোল মুখটা কেমন যেন লম্বাটে লাগছে। চুল অন্যভাবে বাঁধার জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক শরিফাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, শরীলডা বালা?

শরিফা জবাব দিল না।

কি, শরীলডা বালা?

শরিফা থেমে থেমে বলল, পাওডা কাইট্টা বাদ দিছে।

মতি মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। সত্যি সত্যি শরিফার একটা পা নেই।

শরিফা বলল, বাঁচনের আশা আছিল না। কপালে আরো দুঃখ আছে হেই কারণে বাঁচলাম। তোমার শইলডা কেমন?

মতি মিয়া চুপ করে রইল। সে তখনো শরিফার একটি পা যা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে, সে দিকে তাকিয়ে আছে। সেই পা-টিতে আবার লাল টুকটুকে একটা আলতা লাগিয়েছে। শরিফা থেমে থেমে বলল, রহিমা এখনো এই বাড়িতে ক্যান? তারে বিদায় দেও নাই ক্যান? যুবতী মাইয়া মানুষ নিয়া এক ঘরে থাকছ, কামডা ভালো কর নাই। আইজ রাইতে না হইলে সকালেই বিদায় দিবা বুঝছ?

মতি মিয়া জবাব দিল না। শরীফা চিকন সুরে বলল, আর নুরার শইলডা কেমুন কাহিল হইছে। আমি ডাক দিছি, হে আসে নাই। দৌড় দিছে রহিমার দিকে। এই সব ভালা লক্ষণ না। রহিমা গেছে কোন্‌হানে?

৩

রহিমা তার পুঁটলি গুটিয়ে মেয়ের হাত ধরে চৌধুরীবাড়ি চলে গেল। তার নিজের বাড়িঘর কিছু নেই। চৌধুরীদের দালানের শেষ মাথায় একটি অন্ধকার কুঠরিতে সে মাঝে মধ্যে এসে থাকে। চৌধুরীরা কিছু বলে না। যতদিন এখানে থাকে ততদিন যন্ত্রের মতো এ বাড়ির কাজ-কর্ম করে। যেন এটিই তার বাড়ি-ঘর।

এক নাগাড়ে অবশ্যি বেশি দিন থাকতে হয় না। গ্রামের কোনো পোয়াতী মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। কাজ-কর্মের লোক নেই। রহিমাকে খবর দেয়। রহিমা তার ছোট্ট পুঁটলি আর মেয়ের হাত ধরে সে বাড়িতে গিয়ে ওঠে। রান্না বান্না করে। শামুক ভেঙে হাঁসকে খাওয়ায়। ছাগল হারিয়ে গেলে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজতে বের হয়। যেন নিতান্তই সে এই ঘরেরই কেউ। নতুন বাচ্চাটি একদিন শক্ত সমর্থ হয়ে উঠে, রহিমাকে মেয়ের হাত ধরে আবার ফিরে আসতে হয় চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, এখন আর লাগে না।

দীর্ঘদিন পর আজ এই প্রথম রহিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মতি মিয়ার ঘর বাড়ি কোনো এক বিচিত্র কারণে তার কাছে আপন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এখানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে চমৎকার হতো। তার কপালটা এ রকম কেন?

নতুন বউ হয়ে যখন আসে অনুফার বাবা তখন কামলা মানুষ। বউ তোলার জায়গা নেই। মানুষটা নতুন বৌকে চৌধুরীদের বারিন্দায় বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেছে ঘর-দুয়ারের ব্যবস্থা করতে। চৌধুরী সাহেব মহা বিরক্ত, নতুন বৌয়ের সামনেই ধমকালেন, আহাম্মক কারে কয়। এখন কাম-কাজের সময় কেউ কি বিয়া শাদি করে? তোর মতো আহাম্মক দুনিয়ার আলমে নাই রে মদু।

লোকটা দাঁত বের করে হাসে। চৌধুরী সাহেব প্রচণ্ড ধমক দেন- হারামজাদা হাসিস না। আমার পুবের একটা ঘর খালি আছে, বৌরে সেইখানে নিয়া তোল।

-চদুরী সাব নিজের একটা ঘরে নিয়া তুলনের ইচ্ছা। বাঁশ-টাশ যদি দেন তো একটা ঘর বানাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, ঘর তুলবি জায়গা জমি কই? ঘর তুলবি কিসের উপর?

আমারে বসত বাড়ির লাগি একখানি জায়গাও যদি দেন। ধীরে ধীরে দাম শোধ করবাম।

বলতে বলতে লোকটা হাসে। যেন খুব একটা মজার কথা বলছে। চৌধুরী সাহেব অবশ্যি তাকে জায়গা দেন। মসজিদের কাছের এক টুকরো পতিত জমি। লোকটা ঘরামীর কাজে খুব ওস্তাদ ছিল। দেখতে দেখতে বাঁশ কেটে চমৎকার একটা ঘর তুলে ফেলল। নতুন কাটা কাঁচা বাঁশের গন্ধে রহিমার রাতে ঘুম আসে না। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। লোকটির অবশ্যি ফুর্তির সীমা নেই। দুপুর রাতে কুপি জ্বালিয়ে বাঁশের খাঁজি কাটিছে। ঘরের চারদিকে বেড়া দিবে। নিজের এক জিনিস সে আনতো না।

কিন্তু সেই বৎসর খুব কাজে ফাঁকি দিল। চৌধুরীদের তখন জালা বোনা হচ্ছে। দম ফেলার সময় নেই। কাজে বিরাম দিয়ে এক দণ্ড যে হুঁকা টেনে শরীর গরম করবে সে অবসরটাও নেই। এর মধ্যেই দেখা গেল মনু উধাও। অন্য মনিব হলে কি হতো বলা যায় না, চৌধুরী সাহেব বলেই দেখেও দেখেন না। পুরুষ মানুষ দিনে দুপুরে বাড়ি এসে বৌয়ের সঙ্গে গল্প, কি লজ্জার কথা। রহিমা শরমে মরে যায়। কিন্তু লোকটার লাজ-লজ্জার বালাই নেই। এক রাত্রে রহিমাকে জোর করে নৌকায় তুলে বড় গাঙ পর্যন্ত চলে গেল। চাঁদনি রাতে নৌকা বাওয়ার মধ্যে খুব নাকি আনন্দ। আনন্দ ছিল ঠিকই। নদীর জলে ভেসে পড়া জোছনা, দূরের বিল থেকে ভেসে আসা হুম হুম শব্দ, দুই পাশে গাছ-গাছালির গায়ে মাখা অদ্ভুত এক জোছনাভেজা অন্ধকার। কি যে ভালো লেগেছিল রহিমার! এর মধ্যে ঐ লোক আবার ভাঙা গলায় গান ধরল। সুর-তাল কিছুই নেই তবু সেই গান শুনে বারবার চোখ ভিজে উঠল রহিমার।

মানুষটি বড় সৌখিনদার ছিল। দু টাকা দিয়ে একবার এক গায়ে মাখা সাবান কিনে আনল। কি বোটকা গন্ধ। গা বমি বমি করে। আরেকবার কিনল হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রবারের জুতো। এই প্যাক কাদার দেশে কেউ জুতো কিনে? সরকার বাড়ির মেজো সরকার পর্যন্ত খালি পায়ে মাঠে যান ক্ষেত দেখতে। জুতো কেনার পর থেকে মচ মচ শব্দে লোকটা শুধু হাঁটে। চৌধুরী সাহেব একদিন ডেকে বললেন, টেকা-পয়সা খামাইবার অভ্যাসটা কর মনু। নিজের একটা বাড়ি-ঘর কর। বিয়া-সাদি করছস, দায়-দায়িত্ব আছে। খামাখা এই জুতাজোড়া কিনলি ক্যান?

জুতাজোড়া চদুরী সাব হস্তায় পাইছি। খুব কামের। পানির মইধ্যে হারাদিন থাকলেও এক ফোঁটা পানি ঢুকতো না।

[illegible] সব কথা বাদ দে মনু।

লোকটার স্বভাব তবু বদলায় না। জষ্ঠি মাসে ছাতি কিনে ফেলল একটা। বাহারি ছাতি। বাটের মধ্যে হরিণের মুখ। বড়ই রাগ হয় রহিমার। কিন্তু কার ওপর রাগ করবে? এই লোক কি রাগ-টাগ কিছু বুঝে? চৌধুরী সাহেব খুব বিরক্ত হন।

বৃষ্টি বাদলা কিছু নাই। শুকনা দিন। মাথার মইধ্যে ছাতি কেন রে মনু?

নয়া কিনছি চদরী সাব। পাইকারি দরে দিছে।

তোর কপালে দুঃখ আছে মনু।

হা হা করে হাসে মনু। যেন ভারি একটা মজার কথা শুনল।

সেই লোক কোথায় যে হারিয়ে গেল!

ময়নার নৌকায় মোহনগঞ্জ গিয়েছে পরদিন ফেরার কথা, আর ফিরে নাই। দেখতে দেখতে মাস শেষ হলো। কোনো খোঁজই নেই। কি কষ্ট কি কষ্ট! অনুফা তখন পেটে। রাতের পর রাত জেগে বসে থাকে রহিমা। টুক শব্দ হলেই লাফ দিয়ে উঠে, আসল বুঝি। নানা রকম উড়ো খবর আসে। একবার শুনল, বাজারের একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে। সেই মেয়েমানুষটা চোখে সুরমা দেয় ঘাগরা পরে। আবার একবার শুনল আসাম গিয়েছে। আসামে কাঠের ব্যবসা করে।

হয়তো তাই একদিন টাকা-পয়সা নিয়ে গভীর রাতে রবারের জুতোয় মস মস শব্দ করে লোকটা উপস্থিত হবে। রহিমা যত রাগই করুক লোকটা গলা ফাটিয়ে হাসবে হা হা হা।

বৈশাখ মাসে অনুফার জন্ম হলো। চৌধুরী সাহেব বললেন, বাচ্চা নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। রহিমা রাজি নয়। হঠাৎ যদি কোনোদিন লোকটা এসে উপস্থিত হয় তখন?

গাঁয়ের সবাই সাহায্য করেছে। চাল ডাল তরি তরকারি অভাব কিছুরই হয়নি। চৌধুরী সাহেব মেয়ের মুখ দেখে ২০টি টাকা দিলেন। আমিন ডাক্তারের মতো হতদরিদ্র লোকও পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল।

অনুফা একটু বড় হতেই অন্য রকম ঝামেলা শুরু হলো। গভীর রাতে ঘরের পাশে কে যেন হাঁটা হাঁটি করে। খুট খুট করে দরজায় শব্দ। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে রহিমা।

কেডা গো, কেডা?

আর কোনো সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত যেতে হলো সুরুজ মিয়ার বাড়ি। চৌধুরী সাহেবের ওখানে যেতে সাহসে কুলোয় না। ছোট চৌধুরী পাগল মানুষ। কোনো কোনো সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে রাখতে হয়।

সুরুজ মিয়ার স্ত্রীটি চির রুগ্ন। তার দু'বছরের ছেলেটিও সে রকম। রাত দিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। রহিমার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত রইল না। ধান কাটার সময় তখন। সুরুজ মিয়া অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। তিন চার জন উজান দেশী জিরাতি কামলা তার। সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত বাটা-বাটনি করতে হয় রহিমাকে। খারাপ লাগে না। কিন্তু এক গভীর রাতে সুরুজ মিয়া এসে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। স্তম্ভিত রহিমা কিছু বুঝবার আগেই সুরুজ মিয়া তার মুখ চেপে ধরল, শব্দ কইরো না, মাইয়া জাগবো।

মেয়ে অবশ্যি জাগল না। এক সময় অন্ধকার ঘরে বিড়ি ধরাল সুরুজ মিয়া। ফিসফিস করে বলল, পাপ যা হওনের হে তো আমার হইল, তুমি কান্দ ক্যান? শরীরের মইধ্যে কোনো দোষ লাগে না। বুঝছ?

রহিমা চলে আসল চৌধুরী বাড়ির অন্ধকার কোঠায়। ছোট চৌধুরী লাল চোখে ঘুরে বেড়ায়। রহিমার আর ভয় লাগে না। অনুফাকে মাঝে মাঝে তাড়াও করে। অনুফা খেলা মনে করে খিলখিল করে হাসে। ছোট চৌধুরী চোখ বড় বড় করে বলে, হাসিস না হারামজাদি কিন্তু। খবরদার হাসিস না।

এক সময় সেই লোকটির চেহারাও রহিমার মনে রইল না। মাঝে মাঝে খুব যখন ঝড় বৃষ্টি হয়, বিলের দিক থেকে শাঁ শাঁ শব্দ ওঠে, তখন ভাবতে ভালো লাগে লোকটা রবারের জুতো পায়ে দিয়ে মচমচ করে যেন এসেছে। অসম্ভব তো কিছুই নয়। হারিয়ে যাওয়া মানুষ তো কতই ফিরে আসে।

কিংবা কে জানে সেই লোকটি হয়তো কোনো এক ভিন দেশে গিয়ে আমিন ডাক্তারের মতো মহাসুখে আছে। আমিন ডাক্তার যেমন একদিন গয়নার নৌকায় করে

গোহাটীতে উপস্থিত হলো তারপর আর যাওয়ার নাম করল না। কে জানে সেও উজান দেশে তার বৌ-মেয়ে ফেলে এসেছে কি না। হয়তো তারাও অপেক্ষা করে আছে কবে ফিরবে আমিন ডাক্তার। রহিমার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

৪

শরিফার কিছুই ভালো লাগে না।

এটি যেন তার নিজের বাড়ি নয়। যেন সে বেড়াতে এসেছে। পাড়া প্রতিবেশী বৌ ঝিরাও কেমন যেন সমীহ করে কথা বলে। একটু দূরত্ব রেখে বসে। নানান কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, কইটা পাওডা বই ফালাইয়া আইছো?

শরিফার অসহ্য বোধ হয়। রুক্ষ গলায় বলে, হাসপাতালেই রাইখ্যা আইলাম। সাথে আইনা কি করবাম?

নইমের বৌ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, পাওডারে কবর দিছো?

শরিফার কাঁদতে ইচ্ছা করে। এক পা নিয়ে কাজ-কর্ম সে কিছুই করতে পারে না। সারা সকাল লেগে যায় ভাত ফুটাতে। থালা বাসন ধোয়ার জন্যে আজরফকে কলসি নিয়ে পানি এনে দিতে হয়। হাসপাতালে থাকার সময় এই সব ঝামেলার কথা তার মনে হয়নি। আমিন ডাক্তার সব দেখে শুনে গম্ভীর হয়ে বলল, রহিমারে খবর দিয়া আনা দরকার সোভাইন।

না।

কিছু দিন সে থাকুক।

কইলাম তো না।

সুবিধার লাগিন কইতেছি।

আমার সুবিধা দেখনের দরকার নাই।

শরিফা কাঁদতে শুরু করল। তার একটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। প্রায়ই যেকোনো প্রসঙ্গে কথা বার্তা বলতে শুরু করে শেষ পর্যায়ে কাঁদতে শুরু করবে।

সোভাইন কান্দনের কারণ তো কিছু নাই।

যার আছে হে বুঝে।

ইদানীং শরিফার মনে ধারণা হয়েছে মতি মিয়া তাকে এখন আর দেখতে পারে না। গত রাত্রে মতি মিয়া বারান্দায় বসেছিল। শরিফা তিন বার গিয়ে ডাকল। তিন বারই সে বিরক্ত হয়ে বলল, ঘুমইবার সময় হউক, সইন্ধ্যা রাইতেই ডাক ক্যান? আমি তো আর নয়া সাদি করি নাই সইন্ধ্যা রাইতেই ঘরে খিল দেওনের গোপাড় করতাম।

কি কথার কি জবাব। শুধু মতি মিয়া নয় আজরফ পর্যন্ত তার কথার জবাব দেয় না। এক কথা দশবার জিজ্ঞেস করতে হয়।

একদিন দেখা গেল আজরফ বাঁশ আর দড়ি দিয়ে খড়ের লাগোয়া নতুন একটা

নতুন ঘর তুলছে। নুরুদ্দীন মহাউৎসাহে এটা ওটা আগিয়ে দিচ্ছে। মতি মিয়া হুঁকা হাতে দাওয়ায় বসে তদারক করছে। ঘরে নতুন কাজ কর্ম হলে আজ কাল আর কেউ শরিফাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। শরিফা মুখ কালো করে বলল, আজরফ, ঘর তুলতাছস ক্যান?

আজরফ জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি।

আজরফ নয়া ঘর তুলনের দরকারডা কি?

জবাব দিল মতি মিয়া, পুলাপান বড় হইতাছে একটা ঘর তো দরকার।

শরিফা লক্ষ্য করল নুরুদ্দীন মুখ টিপে হাসছে।

বিষয়টা কি নুরা?

নুরুদ্দীন দাঁত বের করে হাসল।

ঘর উঠতাছে রহিমা খালার লাগি। রহিমা খালা আর অনুফা থাকবে।

শরিফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। মতি মিয়া থেমে থেমে বলল, তোমার সুবিধা হইব খুব। ঘরের কাজ কাম দেখব।

আমি বাইচ্চা থাকতে এই বাড়িতে কেউ আসত না।

মতি মিয়া বলল, আইজ সইন্ধায় আইব, খামাখা চিল্লাইও না।

আমি গলাত দড়ি দিয়াম কইতাছি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে ডাকল, 'আজরফ'।

জি।

তোর মারে বালা দেইখ্যা একটা দড়ি দে দেহি।

রহিমা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়ল।

সে তার যাবতীয় সম্পত্তিও সঙ্গে এনেছে। একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছয় সাতটি ছোট-বড় পুঁটলি, হাঁড়ি, কলকি। অনুফার হাতে দড়ি বাঁধা একটা হাঁস। রহিমা শরিফার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, বুজির শইলডা বালা?

শরিফা কোনো কথা বলল না। রাতে খাওয়ার সময় বলে পাঠাল তার খিদে নেই। অনেক রাত্রে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরিফা শুনল নতুন চালা ঘরে খুব হাসা হাসি হচ্ছে। মতি মিয়া কি একটা বলছে, সবাই হাসছে। সবচে উঁচু গলা হচ্ছে নুরুদ্দীনের।

অনেক রাত্রে মতি মিয়া যখন ঘুমাতে আসল শরিফা তখনো জেগে। কুপি নিভিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শরিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, একটা কথার সত্যি জবাব দিবা?

কি কথা?

তুমি কি রহিমারে বিয়া করতে চাও?

মতি মিয়া দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বলল, হু।

তুমি রহিমারে এই কথা কইছ?

না। আমিন ডাক্তার কইছে রহিমার মত নাই। তার ধারণা মনু বাইচ্চা আছে।

মতি মিয়া হুক্কা ধরাল। শরিফা ধরা গলায় বলল, 'বিয়াডা করো'

মত না থাকলে বিয়াডা হইব কেমনে?

আইজ মত নাই, একদিন হইব।

মতি মিয়া নির্বিকার ভঙ্গীতে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে লাগল। পরিফা সারা রাত জেগে বসে রইল।

৫

গোটা জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি।

বৃষ্টি-বাদলা না হলে জ্বর-জারি হয় না। রুগী পত্র নেই, আমিন ডাক্তার মহা বিপদে পড়ে গেল। হাত একেবারে খালি। চৌধুরীবাড়িতে তিরিশ টাকা কর্জ হয়েছে। গত বিশ দিনে রুগী এসেছে মাত্র একটি। সুখান পুকুরের অছিমুদ্দীনের মেজ ছেলে। ভিজিটের টাকা দূরে থাক ওষুধের দামটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অছিমুদ্দীন নিমতলীর পীর সাহেবের নামে কিরা কেটেছে হাটবার দিন সকাল বেলা এসে দিয়ে যাবে। নিমতলীর পীর জ্যান্ত পীর। তার নাম নিয়ে টাল বাহানা করা যায় না। কিন্তু অছিমুদ্দীন লোকটি মহা ধুরন্ধর। আজ নিয়ে তিন হাট গেল তার দেখা নেই।

আমিন ডাক্তার শুকনো মুখে সারা হাট খুঁজে বেড়ায়। হাটের দিন চাষা-ভূষার মতো থাকা যায় না। দশ গ্রামের লোকজন আসে। নতুন মানুষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। কাজেই হাটবারগুলিতে আমিন ডাক্তার একটু বিশেষ সাজ-সজ্জা করে। আজকে দেখা গেল আমিন ডাক্তারের গায়ে এই গরমেও একটি লাল কোট। হাতে ডাক্তারি ব্যাগটা কায়দা করে ধরা। ব্যাগটিতে ইংরেজি লেখা–

ডাক্তার এ, রহমান

প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার

আমিন ডাক্তারের চোখে নিকেলের চশমা। লোকজন চিনতে হয় না। বার বার দেখতে হয়। অছিমুদ্দীনের মেজো হাটায় থাকার কথা। সেখানে পাওয়া গেল সিরাজুল ইসলামকে। সিরাজুল ইসলাম নিমতলির ডাক্তার। সমগ্র ভাটি অঞ্চলে তার নামী ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি। লোকটি ছোট খাট, টেনে টেনে অত্যন্ত কায়দা করে কথা বলে। সিরাজুল ইসলাম আমিন ডাক্তারকে দেখা মাত্র এক গাল হেসে বলল, এই গরমের মধ্যে এমন কোট? গর্মি গর্মি হয়ে মরবেন, বুঝলেন?

আমিন ডাক্তার হাটের দিনগুলিতে যথা সম্ভব শহুরে কথা বলতে চেষ্টা করে। চারদিকে লোকজন আছে। ডাক্তার শহুরে কথা বললে এরা খুব সমীহ করে।

শরীরটা খারাপ। জ্বর জ্বর ভাব ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, এই জন্যেই গরম কাপড় পরলাম।

চশমা নতুন নিলেন নাকি?

হুঁ।

সিরাজুল ইসলাম খিল খিল করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কি আছে আমিন ডাক্তার বুঝতে পারল না।

হাসেন কেন?

হাসি আসলে হাসব না? বলছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে কিভাবে? আরে এখনো ইনফ্লুয়েঞ্জাই চিনলেন না, ডাক্তারী করবেন কিভাবে? হা হা হা। যেমন দেশ তেমন ডাক্তার।

সিরাজুল ইসলামের হাসির শব্দে লোক জমে গেল। আমিন ডাক্তার চট করে সরে পড়ল। মেছো হাটায় অছিমুদ্দীকে পাওয়া গেল না। অথচ তার এখানেই থাকার কথা। কারণ ছাড়া এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করা যায় না। আমিন ডাক্তার এক প্রকাণ্ড রুই মাছ দাম করে ফেলল। গম্ভীর গলায় বলল, মাছ কত রে?

মাছ বিক্রি করছিল নিমতলীর জলিল। সে দামে না বলে মাছ গেঁথে ফেলল।

আপনের সাথে দর দাম কি ডাক্তার সাব? যা হয় দিবেন।

আরে ইয়ে এত বড় মাছ। দাম টাম কি বল শুনি।

শুনা শুনির কিছু নাই। বড় গাঙের মাছ, এর সুয়াদই আলাদা।

আমিন ডাক্তার পড়ে গেল মহা বিপদে। বহু কষ্টে মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, মুস্কিল হয়ে গেল দেখি। টাকা তো আনতে মনে নেই। কি যেন বলে ভুলে বোধ হয় বাড়িতে ফালাইয়া আসছি।

মুস্কিল কিছু না ডাক্তার সাব, টেকা আপনে পরের হাটে দিবেন।

আমিন ডাক্তার মাছ হাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। এক বার মনে হলো অছিমুদ্দীনের মতো দেখতে কে যেন হুট করে তরকারি হাটার দিকে চলে গেল। এত প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে অছিমুদ্দীনকে খুঁজে বের করার আর উৎসাহ রইল না। মাছ কেনাটা অবশ্য পুরোপুরি বৃথা গেল না। সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দেখা হয়ে গেল।

মাছটা কিনলেন নাকি ডাক্তার সাব?

তা কিনলাম।

হুঁ, রোজগার পাতি ভালোই মনে হয়?

আমিন ডাক্তার যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, পাই কিছু। না পাইলে কি আর ভাটি অঞ্চলে পইড়া থাকি?

সিরাজুল ইসলাম শুকনো মুখে চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার হৃষ্ট চিত্তে সারা হাটে দুটি চক্কর দেয়। হাতে যে একটা পয়সা নেই, চৌধুরীদের কাছে ত্রিশ টাকা কর্জ সেই সব আর মনে থাকে না। মুখের উপর অতিরিক্ত একটা গাম্ভীর্য টেনে আনে। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর হয়ে বলে, কি ভালো?

কেডা ডাক্তার সাব না?

হুঁ। ছিলাম না অনেক দিন। নিখিল সাব ডাক্তারের কাছে ছিলাম। নতুন চিকিৎসাপাতি শিখলাম; সাহেব খুব স্নেহ করতেন আমাকে। ডাক্তার ডাক্তারের মর্যাদা বুঝে তো। অশিক্ষিত মুর্খ তো নয়, কি বল?

গো হাটার কাছে দেখা হলো মতি মিয়ার সঙ্গে। মতি মিয়ার কেমন যেন দিশাহারা ভাব। এত বড় একটা মাছ আমিন ডাক্তারের হাতে, তা মতি মিয়ার চোখেই পড়ল না।

ডাক্তার, তোমার সাথে একটা জরুরি আলাপ আছে।

আমিন ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, তোমার কাছে সাড়ে পাঁচ টাকা পাই মতি। টাকাটা আমার বিশেষ দরকার।

তোমারে কখন থাইক্যা খুঁজতাছি। আছিলা কই?

বুঝলা মতি, অসুদের জন্যে তিন টাকা আর তোমার ...

কথা শেষ হবার আগেই মতি মিয়া আমিন ডাক্তারকে টেনে এক পাশে নিয়ে আসে। গলার স্বর দুই ধাপ নিচে নেমে যায়। বিষয়টি সত্যি জরুরি। 'রূপকুমারী' যাত্রা পার্টির অধিকারী খবর পাঠিয়েছে মতি মিয়া যদি বিবেকের পাঠ করতে চায় তাহলে যেন অতি অবশ্যি মোহনগঞ্জ চলে আসে। আগের বিবেক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে বলেই এই সুযোগ।

বুঝলা ডাক্তার, বিবেকের পার্টে মোট দশ খান গান।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, আমারে কি জন্যে দরকার সেইটা তো মতি ভাই বুঝলাম না।

পরিবানুরে একটু বুঝাইয়া কইবা। তোমারে খুব মানে।

তুমি নিজেই কও।

আমি কই ক্যামনে? আমার সাথে তো কথাই কয় না

আবার হইল কি?

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমারে বিয়া করবার চাইছি হেইটা শুনার পরে কথা বন্ধ।

আমিন ডাক্তার আকাশ থেকে পড়ল।

রহিমারে শাদি করবা? এই কথা তো আগে কও নাই।

মজাক কইরা কইছি। হাসি-তামশার কথা।

তুমি লোকটা অদ্ভুত মতি ভাই।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, অদ্ভুতের কি দেখলা? অন্যায়টা কি কইছি? আমার বাড়িত সারা জীবনের লাগি থাকবো। বউ হইয়া থাকনটা ভালা না?

আমিন ডাক্তার চুপ করে রইল। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমা রাজি না' কিনা হেইডাও তুমি একটু জাইন্যা দিবা, বুঝছ?

কি সব কথা যে তুমি কও মতি ভাই।

মতি মিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, আইজ রাইতেই আইবা ঠিক তো'

দেখি।

দেখা দেখির কিছুই নাই আইবা আইজ।

আইচ্ছা।

মাছটা কিনলা না কি ডাক্তার? বিষয় কি?

বিষয় কিছু না, মাছটা লইয়া যাও। দোস্তাইনরে কইও রাইতে তোমরার সাথে ভাত খাইয়াম।

অত বড় মাছ কিনলা, তোমার হুনছি টেকা পয়সা কিছুই নাই।

আমিন ডাক্তার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আগামী হাটবারে টাকার কি হবে কে জানে।

বাড়ি ফিরতে দেরি হলো। মতি মিয়া জোর করে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। এক আনা করে কাপ। সেই সঙ্গে দুই পয়সা করে একটা টোস্ট বিস্কুট।

দোকানের চায়ের সুয়াদই আলাদা, কি কও ডাক্তার?

হুঁ।

আরেক কাপ খাইবা?

নাহ্।

আরে খাও। এই আরো দুইটা দে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতি মিয়া অস্বাভাবিক নিচু স্বরে বলল, বাজারে তিনটা মাইয়া আইছে দেখছ? হাটবার দেইখ্যা রঙ-তামশা করতাছে।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে তাকাল।

মতি মিয়া বলল, সাক্কাবের মেয়ে মানুষ ছাড়া কি হাটি জমে কও দেহি? এর মইধ্যে একটার নাম ফুলন। কাঁচা হলদীর লাহান গায়ের চামড়া। আর চুল কি।

তুমি অত কিছু জানলা ক্যামনে?

আহ্ দেখলাম। দূর থাইক্যা দেখলাম। তুমি কি ভাবছ গেছিলাম? মাবুদে এলাহী।

চা গলায় লেগে মতি মিয়া বিষম খেলো।

মেয়ে তিনটি নৌকা নিয়ে এসেছে। সেজে গুজে নৌকার সামনে বসে আছে দুজন। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল একটি মেয়ে সত্যি অপূর্ব। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবী প্রতিমার মতো লাগছে। মতি মিয়া আমিন ডাক্তারের হাতে একটি মৃদু চাপ দিয়ে বলল, চউখ ট্যারা হইয়া যায় কি কও ডাক্তার? ফুলনের আরেকটা নাম হইল গিয়া তোমার পরীবানু।

তুমি জানলা ক্যামনে?

হুনছি। হুনা কথা।

উত্তর বন্দে নেমে মতি মিয়া গুন গুন করে গান ধরল,

"ও কইন্যা সোনার কইন্যা রে

ও কইন্যা রূপের কইন্যা রে

................."

মতি মিয়ার গলা ভালো, আমিন ডাক্তারের মনটা উদাস হয়ে গেল।

৬

কাল সারারাত শরিফার ঘুম হয়নি।

ইদানীং প্রায়ই এ রকম হচ্ছে। সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটে। পাশেই মতি মিয়া গাছের মতো ঘুমায়। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাল রাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গায়ে ধাক্কা দিয়ে মতি মিয়ার ঘুম ভাঙাল। মতি মিয়া ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কি হইছে?

বাংলা ঘরে কি যেন শব্দ করে। মনে লয় চোর আইছে।

আছে কি আবার, চোর আইব, ঘুমাও।

দেইখ্যা আও না।

মতি মিয়া ঘুরে আসল, কোথাও কিছু নেই, খা খা করছে চারদিক। মতি মিয়া ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার তাকে শরিফা ডেকে তুলল, আমার পিছন বাড়িত যাওন লাগবো।

যাওন লাগবো-যাও।

একলা যাই ক্যামনে?

দুঃখেরী মাগী! ঘুমাইতে যাওনের আগে সব শেষ কইরা থাকিতে পারন না?

ঠিক যাওন লাগত না।

মতি মিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শরিফা গুন গুন করে কাঁদতে শুরু করল। লোকটা এই রকম কেন? এমন ভাব করছে যেন শরিফা একটা কাঠের পুতলি। ছেলেগুলিও দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। নুরুদ্দীন তো তাকে সহ্যই করতে পারে না। রাত দিন রহিমার পিছে পিছে ঘুরঘুর করে। একদিন সে গোস্সা করেছে ভাত খায় না। কত সাধাসাধি। মতি মিয়া বলল, আজরফ বলল, এমনকি আমিন ডাক্তার পর্যন্ত সাধ্য সাধনা করল। খাবেই না। শেষটায় রহিমা গিয়ে বলল, "বাপধন আও আমার পাতে চাইরডা খাও।"

অমনি সুর সুর করে খেতে বসল। যেন কিছুই হয়নি।

এই সব কথা মনে আসলে চোখে পানি আসে। শরিফা ফুঁপিয়ে উঠল।

এই কান্দ ক্যান?

কান্দি না।

ফুসফুস করতাছ ক্যান?

শরিফা ধরা গলায় বলল, আমি বাপের বাড়িত গিয়া কয়েকটা দিন থাকতাম চাই।

বাপের বাড়িত আছে কেডা?

ভাই আছে।

ভাই?

গলা ফাটিয়ে মতি মিয়া হাসল, এই সব চিন্তা বাদ দেও। অত যে ঝামেলা গেছে তোমার ভাইদের কেউ একটা খোঁজ নিছে? কও নিছে খোঁজ?

শরিফা মিন মিন করে কি বলল ঠিক বুঝা গেল না।

চিল্লাচিল্লি বন্ধ কইরা আখি নয়ন বন্ধ।

আমি চিল্লাচিল্লি করি?

না তুমি তো নয়া কইন্যা। মুখের মধ্যে একটা কথাও নাই।

শরিফা আজকাল অবশ্যি খুবই চেঁচামেচি করে। রহিমার সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া করে।

এইডা কি বলছ ও রহিমা। ওয়াক থু। হলুদের শক্তে মুখে দেখা যায় না। হলুদ সস্তা হইছে? বাপের বাড়ির হলুদ পাইছস? ঝাঁটা দিয়া পিডাইয়া এই সব আপদ দূর করা লাগে।

সামান্য জিনিস থেকে কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। শুধু তাই নয় সুযোগ পেলেই রহিমার মেয়েটাকে সে মারধোরও করে। মেয়েটাও মার মতো চুপচাপ। মার খেয়েও শব্দ করে না। একা একা পুকুর পাড়ে বসে থাকে। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাউকেই সহ্য করতে পারে না। আমিন ডাক্তারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে কাঁদতে শুরু করে। আমিন ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বলে, কান্দনের কি হইল ও দোস্তাইন?

আমারে বিষ আইন্যা দিয়েন।

কি ধরনের কথা কন। না দোস্তাইন বায়ে চিন্তা বাদ দেওন দরকার।

ধান কাটা শুরু হবার আগে মতি মিয়া মোহনগঞ্জে চলে যাবে। রূপকুমারী যাত্রা পার্টির অধিকারী লোক পাঠিয়েছে। শরিফা আকাশ থেকে পড়ল, ওখানে তুমি যাইবা ক্যামনে, ধান কাটব কেডা?

আজিজরা কাটব।

কও কি তুমি? আমারে দুঃখ পুষাও।

চুপ কর, খালি চিল্লায়।

মতি মিয়া গম্ভীর মুখে কাপড় গোছায়। শরিফা নুরুদ্দীনকে পাঠায় আমিন ডাক্তারকে ধরে আনতে। আমিন ডাক্তার আসতে পারে না। দীর্ঘ দিন পর তাকে নেবার জন্যে সুখান পুকুর থেকে নৌকা এসেছে। রুগী মরণাপন্ন, এখনি রওনা হওয়া প্রয়োজন।

নুরুদ্দীন, তর বাপরে ধইরা রাইখা রাখ, আমি আইতাছি রাইতে বুঝছস?

বুঝছি।

কোমরটার অবস্থা খারাপ, এই সময় কেউ যায়? [illegible]

নৌকা ছেড়ে দেয়ার সময় আমিন ডাক্তার আরেক বার গম্ভীর হয়ে বলে, দুই টেকা ভিজিট, অষুধ ভিন্ন। আর নৌকা দিয়া ফিরত দিয়া যাইবা।

সুখান পুকুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দুইয়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে মাইল পাঁচেক হাঁটতে হয়। অসম্ভব কাদা এই অঞ্চলে। বড়ই কষ্ট হয় হাঁটতে। কোথাও থেমে যে বিশ্রাম নেওয়া হবে সে উপায় নেই। রুগীর বাবা ঝড়ের মতো ছুটছে, বার বার বলছে, পা চালাইয়া হাঁটেন ডাক্তার সাব।

বাড়ির সামনে মুখ লম্বা করে সিরাজুল ইসলাম বসে ছিলেন। আমিন ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, আপনাকেও এনেছে দেখি। হুঁ আর কাকে আনবে?

রুগীর বাবা পা ধোয়ার পানি আনতে গেছে, এই ফাঁকে সিরাজুল ইসলাম গলা নিচু করে বললেন, ডাক্তার গিলে খাওয়ালেও কিছু হবে না . শেষ অবস্থা। আর এমন চামার বুঝলেন। দু টাকা দেয়ার কথা, দিয়েছে এক টাকা। মাছের বাজার আর কি?

রুগী দেখে আমিন ডাক্তার স্তম্ভিত। নয় দশ বৎসরের একটা ছেলে। সমস্ত শরীর লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। শরীরে কোনো ব্যথা বোধ নেই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বলছে, পেটের মইধ্যে পাক খায়।

আমিন ডাক্তার এক চামচ এ্যালকালি মিকচার খাইয়ে শুকনো মুখে বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। রোগামতো একটা মেয়ে ছেলেটির হাত ধরে বসে ছিল, সে কাঁদতে শুরু করল। আমিন ডাক্তার বলল, নৌকার জোগাড় দেখেন, হাসপাতালে নেওন লাগবো। দিরং করণ যাইতো না।

ডাক্তারদের জন্যে পান তামাক দেয়া হয়েছে বাহির বাড়িতে। সিরাজুল ইসলাম কিছুই স্পর্শ করবেন না। তিনি এক ফাঁকে আমিন ডাক্তারকে বললেন, হাসপাতালে নেওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এই রুগী ঘন্টা পাঁচেকের বেশি থাকবে না। টাকা-পয়সা যা দেয় নিয়ে সরে পড়েন। রুগী মরলে পয়সাও পাবেন না। আপনাকে কেউ দিয়েও আসবে না। ছোটলোকের দেশে কেউ ডাক্তারি করে?

আমিন ডাক্তার থেমে বলল, 'ওর হইছে কি?'

কিছু বুঝতে পারছেন না?

না।

হুঁ। ওর কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে পানি এসেছে, হাসপাতালেও কিছু করতে পারবে না।

কিছুই করনের নাই?

না।

সিরাজুল ইসলাম উঠে পড়লেন। বেরুবার আগে বললেন, আমি নিজের নৌকা নিয়ে এসেছি। যদি যেতে চান যেতে পারেন।

এই রকম রুগী ফালাইয়া যাই ক্যামনে?

থাকেন তাইলে

সমস্ত দিন কাটল এইভাবে। রাতে অবস্থা খুব খারাপ হলো। আমিন ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে ঘরের দাওয়ায় বসে রইল। বেশ কয়েক বার ছেলের বাবাকে বলল, হাসপাতালে নেওন খুব দরকার। দিরং হইতাছে।

কেউ রুগী নাড়াচাড়া করতে রাজি হলো না। নিয়ামতপুরীর পীর সাহেবকে আনতে নাকি লোক গিয়েছে। তিনি এসে যা বলেন তাই করা হবে। পীর সাহেব মাঝরাতে পৌঁছলেন। ছোট-খাট হাসি-খুশি একজন মানুষ। রুগীকে হাসপাতালে নেয়া ঠিক হবে

কি না জানতে চাইতেই বললেন, ডাক্তার সাব যদি নিতে যান তা হইলে নেওন লাগবো। ব্যবস্থা করেন কিন্তু রুগী দেখে তাঁর মত পালটালো। শান্ত স্বরে বললেন, 'হাতে সময় বেশি নাই।'

ভোর রাতে ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ মানুষের মতো মাথা তুলে বলল, শীত লাগে বাজান।

চার পাঁচটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আমিন ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, শীত কমেছে? ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, 'শীত লাগে। জব্বর শীত লাগে। ও বাজান শইলডার মইধ্যে খুব শীত।'

ফজরের আজানের পর পর ছেলেটি মারা গেল। ছেলের মা খুব কাঁদছিল। কে যেন বলল, কাইন্দেন না। মউতের সময় কান্দন হাদিসে মানা আছে।

নিমতলীর পীর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, দুঃখের সময় না কাঁদলে কোনো সময় কাঁদবে? কান্দুক খুব সুরে সুরে কান্দুক।

বাড়ির সামনে একটি কাঁঠাল গাছের নিচে দুপুর পর্যন্ত বসে রইল আমিন ডাক্তার। পকেটে কিছুই নেই যে একটা কেরাইয়া নৌকা নিয়ে বাড়ি যাবে। এমন অবস্থায় কাউকে বাড়ি ফেরার কথাও বলা যায় না। পেটে অসম্ভব খিদে, মরা বাড়িতে চুলা ধরানো হবে না, কাজেই খাওয়া দাওয়া হবে কি না বলা মুশকিল।

দুপুরের রোদ একটু পড়তেই আমিন ডাক্তার হেঁটে চলে গেল নিমতলী। নিমতলী পৌঁছাতে পৌঁছাতে এক প্রহর রাত হলো। সেখান থেকে সোহাগী আসল জলিলের নৌকায়। তখন মাঝরাত্রি, ঘরে খাবার কিছুই নেই। একটি টিনে চিঁড়া ছিল সেটিও শূন্য। মতি মিয়ার বাড়িতে গেলে হতো। কিন্তু এই দুপুর রাতে যাওয়া ঠিক না।

খিদের জন্য ঘুম আসে না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। মশারিটি শত ছিদ্র। ভন ভন করছে মশা। নতুন মশারি একটি না কিনলেই নয়। আমিন ডাক্তার শুয়ে শুয়ে কত কথাই না ভাবে। কত বিচিত্র কথা মনে আসে। সুখলাল পুকুরের এক বুড়ী মরবার আগে হঠাৎ খুব অবাক হয়ে বলেছিল, ঠান্ডা হাত দিয়া আমারে কে ছুঁইছে। ও ডাক্তার বড় শীত লাগে। বড় শীত লাগে। বড় শীত।

মরবার আগে সবারই শীত লাগে কি না আমিন ডাক্তারের খুব জানতে ইচ্ছা করে।

৭

নুরুদ্দীন খুঁজে খুঁজে চমৎকার একটি মাছ মারার জায়গা বের করেছে। বাড়ি থেকে সোয়া মাইল দূরে জংলা ভিটার ভাঙা ঘাট। জায়গাটি বড় নির্জন। দু'পাশে অন্ধকার করে আছে ঘন কাঁটা বন। ভাঙা ঘাটের ফাঁকে-ফুঁকে সাপের আড্ডা। সে জন্যেই বড় কেউ আসে না এ দিকটায়। ঘাটের লাগোয়া প্রকাণ্ড একটা ডেফল গাছে পাকা ডেফল টুক টুক করে। নুরুদ্দীন ছিপ ফেলে ডেফল গাছে হেলান দিয়ে সারা দুপুর বসে থাকে।

তার সঙ্গে প্রায়ই আসে অনুফা। সে নুরুদ্দীনকে বিরক্ত করে না। লম্বা একটি নারিকেলের ডোগা হাতে নিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কি সব কথা বলে। নুরুদ্দীন মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এ্যাই চুপ। অত কথা কইলে মাছ আইব?

অনুকা অল্প কিছু সময়ের জন্যে চুপ করে আবার কলতান শুরু করে।

এই অনুকা পাগলী নাহি তুই?

অনুকা রাগ করে না। খিলখিল করে হাসে। নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে।

মাছ মারার এই জায়গাটা নুরুদ্দীন খুব সাবধানে গোপন করে রাখে। ঘাস কাটার জন্যে কোন্দায় করে কৈবর্ত পাড়ার মাঝিরা এই খাল দিয়ে বড় গাঙের দিকে যায়। শব্দ পেলেই ডেফল গাছের আড়ালে চট করে লুকিয়ে পড়ে নুরুদ্দীন। তবু কেউ কেউ দেখে ফেলে তখন বড় ঝামেলা হয়।

এইডা কে? মতি ভাইয়ের পুলা না? এই, কি করস তুই?

মাছ মারি।

মাছ মারস? মাথাডা খারাপ নাহি তর? এইডা মাছ মারনের জায়গা? যা বাড়িত যা।

মাছ মারার জন্যে জায়গাটা কিন্তু খারাপ না। আজকেও নুরুদ্দীন দু'হাত লম্বা একটা শোল মেরে ফেলল।

অনুকার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ওখোদারে এইডা তো জব্বর মাছ নুরু ভাই।

শক্ত কইরা মাথাডা ধর। পানিত যেন না পড়ে, সাবধান।

পাকা বর্শেলের মতো মুখ করে নুরুদ্দীন দ্বিতীয়বার ছিপ ফেলতে যায়। কিন্তু বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, এখন আর মাছে খাবে না। চল বাড়িত যাই অনুকা।

না।

না কি? দিমাম এক চড়, বিষ্টি পড়তাছে দেখস না?

পড়ুক।

বলেই অনুকা মাছ হাতে নিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়ে গেল। এই তার একটা খেলা। দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোথাও এক দণ্ডের জন্যে থামবে না।

জঙ্গলা ভিটা থেকে বেরিয়ে নুরুদ্দীন দেখে খুব মেঘ করেছে। ডেফল গাছের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ বুঝা যায়নি। নুরুদ্দীন দৌড়তে শুরু করল। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে। রানীমার পুকুর পাড়ে উঠে আমার আগেই সে ভিজে নাতা নাবুদ হয়ে গেল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সিরাজ চাচার নতুন চালা ঘর। লালচাচি ছুটোছুটি করে ধান তুলছে। উঠুনে দেয়া ধানের বেশির ভাগই গেছে ভিজে। লালচাচি নুরুদ্দীনকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'নুরু হাত লাগা। ধান চাইর আনিছ খুব ভিজব।'

ধান তোলা শেষ হতেই বৃষ্টি থেমে গেল। লালচাচি হাসি মুখে বললেন, কাণ্ডটা কেমুন হইল নুরা?

বিষ্টি আবার আইব চাচি।

ধান তো বেবাক ভিজছে নুরা। করি কি এখন ক দেহি? একলা মানুষ আমি অত ধান শুকাইতে পারি? তুই বিবেচনা কর দেহি? নুরুদ্দীন বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল

লালচাচির ঘরে। লালচাচিকে সে বেশ পছন্দ করে। নুরুদ্দীনের ধারণা লালচাচির মতো সুন্দরী (এবং ভালো) মেয়ে সোহাগীতে আর একটিও নেই। সবচে বড় কথা লালচাচি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। 'ও নুরা তোর চাচারে কইলাম আমার ছোড ভাইটারে আইন্যা রাখতে। কাজ কামে সাহায্য হইব। তোর চাচা কি কয় জানস?

কি কয়?

কয় চোরের গুষ্ঠি আইন্যা লাভ নাই।

কথাডা ঠিক হয় নাই চাচী, অন্যায় হইছে।

আমার দাদা চোর আছিল এইডা অস্বীকার যাই ক্যামনে? কিন্তুক হেইডা কোন আমলের কথা। পুরান কথা তুইল্যা মনে কষ্ট দেওন কি ঠিক?

না ঠিক না চাচি।

হেইদিন তরকারির লবণ এট্টু বেশি হইছে, তোর চাচা কয় চোরের গুষ্ঠি রান্না বাড়া শিখনের তো কথা না।

কথাডা অন্যায় হইছে চাচি।

অত চোর চোর করলে বিয়া করল ক্যান? আমি কি পায়ে ধইর‍্যা সাধছিলাম?

ঠিক কথা চাচি।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লালচাচি কিছুতেই ছাড়বে না। বাপের বাড়ির পুরনো সব গল্প আবার শুনতে হলো। গুড় দিয়ে এক থালা মুড়ি খেতে হলো।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের মুখ শুকিয়ে গেল। আজরফ নাকি তাকে বেশ কয়েকবার খোঁজাখুঁজি করেছে। আজরফকে আজকাল সে খুব ভয় পায়। আজরফ তাকে কিছুই বলে না। তবু কেন জানি ভয় ভয় লাগে। পরিস্কা বলল, মিষ্টি আপনা না খুঁইজে বাইরে ধান মাড়াই দিতে চায়। তরে খুঁজছিল কি যেন কইতে চায়।

কি কইতে চায়?

জিগাই নাই। অত কথা আমি জিগাই না।

নুরুদ্দীনের মনে হলো শুধু সে একা নয়, তার মা নিজেও আজকাল আজরফকে সমীহ করে চলে।

বন্দের মইধ্যে গিয়া জিগাইতাম?

যা জিগা গিয়া।

উত্তর বন্দে আজ খুব কাজের ধুম। নিয়ামত সাব বলেছেন দু'একদিনের মধ্যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হবে। সেই শিলা ফেরাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাজেই সম্ভব হলে আজকের মধ্যেই যেন ধান তুলে ফেলা হয়। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মশা তাড়াবার জন্যে ভেজা খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া করা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা জ্বলন্ত খড়ের দড়ির কাছে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব কাজের চাপ তাদের। ডাক পড়লেই হুকো নিয়ে

ছুটে যেতে হচ্ছে। ধান কাটার পুরা দলটি বৃষ্টিতে ভিজে জব জব। উত্তর বন্দেও আধ হাতের মতো পানি। ঘন ঘন হুংকার টান দিয়ে শরীর চাঙ্গা করে নিতে হয়। উজান দেশের বেশ কিছু কামলা এসেছে ধান কাটতে। এদের হয়েছে অসুবিধা। দিন রাত পানিতে থাকার অভ্যাস না থাকায় হাত পা হেজে গিয়েছে। তারা ক্ষণে ক্ষণে কাজ ফেলে শুকনায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজরফকে খুঁজে বের করতে বেশ দেরি হলো। উত্তর বন্দে আজ সবাই ধান কাটছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় লোকজন চেনা যাচ্ছে না। তার ওপর আজরফ কার জমিতে কাজ করছে তাও ঠিক জানা নেই। তাদের নিজেদের জমির সবটাই পুব বন্দে। নুরুদ্দীন গলা উঁচিয়ে ডাকল, ও ভাই সাব। দুর কাছ থেকে উত্তর হলো, এই দিকে আয় নুরা।

আমারে নি খুঁজছিলা?

আজরফ কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। লুঙ্গির গোঁজ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, বাজানের চিঠি। জলিল মুন্সির সাথে পাঠাইছে। ডাক্তার চাচারে দিয়া পড়াইয়া আন।

আইচ্ছা।

আর হুন আইজ ধান মাড়াই হইব।

কোন সময়?

রাইতে।

গরু পাইবা কই?

কালাচান চাচারে কইয়া রাখছি। তুই আরেক বার গিয়া জিগা।

আইচ্ছা।

যা বাড়িত যা।

ভাত খাইতা না?

আইজ সরকার বাড়িত খাইয়াম। হেরার ধান কাটতাছি।

একটা বোয়াল মাছ মারছি দুই আত লম্বা।

আজরফ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জঙ্গলা বাড়ির ভিটাত আর যাইস না নুরা। জায়গাডা খারাপ। দোষ আছে। হের উপরে আবার সাপের উপদ্রপ।

নুরুদ্দীনের মুখে কথা ফুটে না। তার গোপন জায়গার কথা আজরফ কি ভাবে জানল কে জানে।

বাড়িত যা নুরা।

উত্তর বন্দ থেকে একা একা বাড়ি ফিরতে নুরুদ্দীনের বড়ই ভালো লাগে। এত বড় বন্দ এই অঞ্চলে আর নেই। দিন রাত হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ তোলে। উত্তর-পশ্চিমে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু মনে হয় দূরের আকাশ নেমে এসেছে মাটিতে। পুব দিকে তাকালে নিমতলী গ্রামের সীমানার তাল গাছ দুটো আবছা চোখে পড়ে। তালগাছ

দুটিতে দোষ আছে ; গভীর রাতে মাছ মারতে এসে অনেকেই দেখেছে একটা আগুনের মতো বড় আগুনের গোলা গাছ দুটির মাথায়। এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে আবার ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়েও যাচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বাড়ির পেছনে খোলা চুলায় রান্না চাপিয়েছে। রান্নার আয়োজন নগন্য। ঝিঙে ভাজি আর কেদারির ডাল ভেজা কাঠের জন্যে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে চুলা থেকে। নুরুদ্দীন গিয়ে দেখে একটা কাঠের চোঙায় মুখ দিয়ে আমিন ডাক্তার প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। তার নিজের চোখ মুখ লাল, কি রে নুরা কি চাস? ভাত খাইবি?

নাহ্।

না কিয়ে ক্যান? ঝিঙে ভাজা করলাম। গাওয়া ঘি আছে, দিয়ামনে এক চামুচ।

আইজ না চাচাজী। বাজানের একটা চিঠি আনছি পইড়া দেন।

মতি মিয়া নিজেও লেখাপড়া জানে না। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে–

আমারক মিয়া দোয়াগো,

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার কৃপায় সুস্থ শরীরে শান্তিমতো আছ। পর সমাচার এই যে, আমরা দল লইয়া অতি শীঘ্র নেত্রকোনা যাইতেছি। বিবেকের গান খুব নাম কামাইয়াছে। স্বয়ং কানা নিবারণও বলিয়াছে– গলা খুব উত্তম ! কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন বিবেক ফিরিয়া আসিয়াছে। কাজকর্ম ঠিকমতো করিবা। নতুন ধান উঠিবা মাত্র আমাকে নিম্ন ঠিকানায় বিশটি টাকা অতি অবশ্য পাঠাইবা। কিঞ্চিৎ আর্থিক অসুবিধায় আছি। আজ এই পর্যন্ত। ইতি।

আমিন ডাক্তার চিঠি শেষ করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইল। চিঠিতে কবে ফিরবে কি কোনো উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা শরিফার কোনো কথা নেই।

আমিন ডাক্তার থেমে বলল, তর মায়ের কথাও লেখছে কোণা দিয়া– 'তোমার মাতার কথাও সর্বদা স্মরণ হয়। তুমি তাহার যথা সাধ্য যত্ন করিবা'। নুরা তোর মায়েরে কইস। তার কথাও লেখা।

আইচ্ছা। আর চাচাজী অইজ আমরার ধান মাড়াই। আপনের যাওন লাগব।

দেখি।

দেখা দিছি নাই যাওন লাগব।

রুগী টুগী না থাকলে যাইয়ামনে এক ঘুরান।

ধান মাড়াইয়ের ব্যাপারে নুরুদ্দীনের খুব উৎসাহ।

মাঝরাতের দিকে চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে ধান মাড়াই শুরু হবে। চলবে সারা রাত। একজন পালা করে থাকবে গরুর পেছনে, অন্য সবাই দল বেঁধে উঠোনে বসে গল্প শুনবে। গল্প বলার জন্যে কথক আছে। তাদের বড় দাম এই রাতে। পান তামাকের ডালা খোলা। শেষ রাতে পিঠে চিড়ার ব্যবস্থা।

নুরুদ্দীনের খুব ইচ্ছা এবারও শত বারের মতো আলাউদ্দীনকে খবর দেয়া হয়।

পেশায় সে চোর, কিন্তু তার মতো বড় কথক ভাটি অঞ্চলে আর নেই। সে যখন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে দু'হাত নেড়ে কিস্সা শুরু করে তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পর্যন্ত মনে থাকে না।

শুনেন শুনেন দশজনাতে
শুনেন দিয়া মন
লাল চান বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ

তার পর হেই লাল চান বাদশা উজির সাবরে ডাইকা কইল, ও উজির একটা কথার জবাব দেও দেহি।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দীনের খুব মন খারাপ হলো। কথক আলাউদ্দিন নিমতলী গিয়েছে সন্ধ্যায় ফেরবার কথা এখনো ফেরেনি। যদি না ফিরে? তাহলে বড় কথা শরিফা রেগে গিয়ে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছে অনুফার দিকে। সেই খড়ম কপালে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। অনুফা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। রহিমা মুখ কালো করে ঘরের কাজ কর্ম করছে। নুরুদ্দীন অনুফাকে খোঁজে বেরুল। সে কোথায় আছে তা জানা। ছোট গাঙের পাড়ে জলপাই গাছের কাছে এসে নুরুদ্দীন ডাকল, ও অনুফা।

অনুফা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

আয় বাড়িত যাই।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না।

বড় আন্ধাইর, হাত ধর অনুফা।

অনুফা এসে হাত ধরল। নুরুদ্দীন বলল, আইজ ধান মাড়াই জানস নি।

জানি।

আলাউদ্দীন আইত না।

অনুফা মৃদু স্বরে বলল, আইব।

কি কস তুই।

দেখবা তুমি, আইবো।

তুই খুব পাগলী অনুফা।

অনুফা খিলখিল করে হাসল। কিন্তু কি আশ্চর্য বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল আলাউদ্দীন তার দল নিয়ে এসে পড়েছে। চাঁদ এখনো ওঠেনি। অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দীনের রোগা লম্বা শরীর। সে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকা টানছে।

কিস্সা শুরু হলো অনেক রাত্রে। গ্রামের অনেকেই এসেছে। আপ্যায়ন হচ্ছে ঘরের কর্তা। পান তামাক এগিয়ে দিচ্ছে। বৌ-ঝিরা ভেতর বাড়িতে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর জন্য চেয়ার আনা হয়েছে।

আলাউদ্দীন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে কিস্সা শুরু করেছে। সেই পুরনো লাল চাঁন বাদশার গল্প। কিন্তু এ গল্প কি আর সহজে শুনা পুরনো হয়?

(গীত)

'শুনেন শুনেন দশ জনাতে
শুনেন দিয়া মন।
লাল চান বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ।
লাল চান বাদশার মনে বড় দুক্ষ ছিল,
বার বচ্ছর পার হইল পুত্র না জন্মিল।
লাল চানের দুক্ষ দেইখ্যা কান্দে গাছের পাতা

৮

উত্তর বন্দের সমস্ত ধান কাটা হওয়ার পর পরই 'ফিরাইল সাব' চলে গেলেন। যাবার পরদিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হলো। তাতো হবেই 'মাঠ বন্ধন' নেই। শিলা আটকাবার আসল লোকই নেই। কালাচান খবর নিয়ে আসল—ফিরাইল সাবের জন্যে উত্তর বন্দে যে খড়ের ছাউনি করা হয়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। শিলা বৃষ্টিতে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। সোহাগীর লোকজন স্তম্ভিত।

ফিরাইলের সাবের উপরে রাগ রইছে, বুঝলা না বিষয়টা?

রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফিরাইল সাব এই বৎসর উত্তর বন্দে শিল পড়তে দেননি। সমস্ত নিয়ে ফেলেছেন নিমতলীর বন্দে। ফিরাইল সাব বিদায় নেয়ার আগে গ্রামে এসে উঠেছেন কিছুক্ষণের জন্য। গ্রামের বউ ঝিরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে তাকায়। দেখেই ভক্তি হয়। বয়স খুব বেশি, চল্লিশ হবে না। তবে সাধু গোসাঁই মনে হবে না। একমাথা দাড়ি পাকান চেহারা। মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধে গিয়েছে। হাতে জীয়ল গাছের শিকড়ে তৈরি একটি বাঁকা লাঠি। ফিরাইল সাব যাবার আগে বারবার বলে গেলেন—নিমতলীর তালগাছের নিচে তিনটা বড় শউল মাছ পুড়িয়ে ভোগ দিতে। তালগাছে যে বিদেশী প্রাণীটি বাস করে তাকে তুষ্ট রাখা খুবই প্রয়োজন। বাজ পড়ে যদি তালগাছ দুটির একটিও পুড়ে যায় তাহলে সমূহ বিপদ। বিপদ যে কি তা তিনি ভেঙে বললেন না। পোয়াতী মেয়েছেলেদের ওপর কঠোর নির্দেশ তারা যেন কোনো ক্রমেই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা এই দুই চাঁদে উত্তর বন্দে না যায়।

এ বৎসর খুব ভালো ফলন হয়েছে সোহাগীতে। লগ্নির ধান দেয়ার পরও ধান রাখার জায়গা নেই। আবুল কালামের মতো হতদরিদ্র ভাগী চাষিরও খোরাকি ছাড়াই পঁচিশ মণ ধান হলো। এমন অবস্থায় জমকালো রকমের শিন্নি হবে তা বলাই বাহুল্য। ধান কাটা শেষ হবার পরই প্রথম পূর্ণিমায় সবাই শিন্নির দল বেরুল। এই সব সাধারণত ছেলে ছোকরার ব্যাপার। কিন্তু আমিন ডাক্তারের সে খেয়াল নেই। দলের পুরো ভাগে সে। বাড়ি গিয়ে নেচে কুঁদে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। মূল গায়ক একজন, অন্য সবাই ধুয়া ধরে।

(মূল গীত)
আইলাম গো
খাইলাম গো
বাঘাই সিন্নি চাইলাম।
(ধোয়া) চাইলাম গো। চাইলাম গো।

এই পর্যায়ে হাত পা ছুড়ে নাচ শুরু হয়। মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বাঘাই সিন্নির জন্যে ধামা ভর্তি চাল বের করে দেয়।

আমিন ডাক্তারকে দেখে বয়স্কদের অনেকেই দলে ভিড়ে গেল। সুবহান আলীর মতো গ্রাসভারি মাতব্বর পর্যন্ত বাঘাই সিন্নির গানের শুমারে শামিল হলো।

সিন্নির আয়োজন হয়েছে উত্তর বন্দে। চারদিকে ফকফকা জোছনা। দূরে সোহাগী গ্রাম ছবির মতো দেখা যায়। খোলা প্রান্তরে হাওয়া এসে শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ শব্দ তোলে বাঘাই সিন্নি দলের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। একদিকে সিন্নি রান্না হয় অন্য দিকে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে বাঘাই সিন্নির গান হয়। বড় গঙ্গা দিয়ে বিদেশী নৌকা যায়। তারা কৌতূহলী হয়ে হাঁক দেয়।

কোন গ্রাম?

সোহাগী।

বাঘাই সিন্নি নাকি গো?

হ ভাই।

কেমন জমতাছে?

জব্বর।

খুবই ভালো কথা।

শুধু খোরাকির ধান রেখে বাকি সব ধান আজরফ নীলগঞ্জের হাটে বিক্রি করে দিল। শরিফা আপত্তি করেছিল। কিন্তু আজরফ শক্ত মুখে বলল, ধান থাকলেই খরচ হইব। যে জিনিসের দরকার নেই সেইটিও কিনা হইব।

মুক্তি অবাধ। ইতিমধ্যে নৌকা সাজিয়ে বেদেনীরা আসতে শুরু করেছে। শাড়ি-চুড়ি থেকে শুরু করে পিঠা বানানোর ছাঁচ কি নেই তাদের কাছে? কিনতে কারোর গায়ে লাগে না। নগদ টাকা দেয়ার ঝামেলা নেই, ধান দিলেই হয়।

আজরফ নীলগঞ্জের হাটে ধান বেচে কত টাকা পেল তা শরিফা পর্যন্ত জানতে পারল না। শরিফা খুব বিরক্ত হলো কিন্তু নিজে থেকে জানতেই চাইল না। টাকা পয়সার হিসাব পুরুষ মানুষের কাছে থাকাই ভালো। আর এই সংসারে পুরুষ বলতে তো এখন আজরফই আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই যেন ছেলেটা বড় হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে চলাফেরা করে। যন্ত্রের মতো কাজ করে। নীলগঞ্জ থেকে সে এবার অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। নুরুদ্দীনের জন্যে এনেছে লুঙ্গি আর মাছ মারার বড়শি। তার এবং রহিমার জন্যে এনেছে শাড়ি। শরিফা দুঃখিত হয়ে লক্ষ্য করল দুটি শাড়ির জমিনই এক রকম।

দামও নিশ্চয়ই এক। রহিমা ভাবে কেন থাকতে দেয়া হয়েছে দয়া করে, এর বেশি আর কি? তার জন্যে মক্তার শাড়ি কি নীলগঞ্জের হাটে ছিল না? শুধু এখানেই শেষ না অনুফার জন্যে সে একটা জামাও এনেছে। জামার বড় বড় ছাপার ফুল। ম্যালা দাম নিশ্চয়ই।

বর্ষা এসে গেছে।

ক'দিন ধরেই ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। পথ-ঘাটে এক হাঁটু কাদা। আজরফ ঘরেই বসে থাকে। করার তেমন কিছু নেই। আগামী পাঁচ মাস ধরে জোয়ান মর্দ ছেলেরা কড়ি খেলবে, ষোল-ঘুটি খেলবে। কেউ কেউ ফুর্তির খোঁজে চলে যাবে উজান দেশে। এই পাঁচ মাস বিশ্রামের মাস ফুর্তির মাস।

শরিফা খবর পেল। আজরফ যাচ্ছে উজান দেশে। কি সর্বনাশের কথা; এইটুকু ছেলে সে যাবে উজানে। উজানের মেয়েগুলি ফষ্টি-নষ্টিতে ওস্তাদ, কি থেকে কি হবে কে জানে। তার উপর বাজারের খারাপ মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়লে ফতুর হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আজরফের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে কাজ কর্মের খোঁজে যাবে। উজান মুলুক থেকে কিছু টাকা পয়সা যদি আনা যায় তাহলে ধান বেচা টাকার সঙ্গে যোগ করে জমি রাখা যাবে। শরিফা স্তম্ভিত।

আমরারে দেখাশোনা করবে কে?

নুরা আছে, রহিমা খালা আছে তারা দেখবো।

শরিফা কাঁদে খুন খুন করে। আপন মনে বিড় বিড় করে, রক্তের মধ্যে দোষ। ঘরে মন টিকে না রহিমাকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেডা কি বিয়া করতে চায়?'

রহিমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, না বুঝি।

হাসন রুবান রহিমা; হাসির কথা কিছু কই নাই। বিয়া করার মতলব চায় তখন পুলাপান এই রকম ঘর ছাড়নের ভয় দেখায়।

না বুঝি বিয়া করবো কি। বাচ্চা পুলা।

আজরফকে এখন আর বাচ্চা পুলা বলা যায় না।

গম্ভীর হয়ে দাওয়ায় যখন বসে থাকে তখন শরিফার পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এর মধ্যে হঠাৎ মতি মিয়ার একটি চিঠি এসে উপস্থিত। শম্ভুগঞ্জ থেকে লেখা। আমিন ডাক্তার এসে চিঠি পড়ে দিয়ে যায়।

মদন থানার রাধাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁকে একটি সোনার মেডেল দিয়েছেন। মেডেলটি ছয় আনি ওজন।

মেডেলের ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। রুপার একটি মেডেল সাড়ে তিন টাকা খরচ করে মতি মিয়া নিজেই কিনেছে। আসলে নামায সময় গায়ে কোনো মেডেল না থাকলে লোকজনের ভক্তি পাওয়া যায় না। আমিন ডাক্তারকে চিঠিটি তিন চারবার পড়ে শুনাতে হয়। সেই রাত্রে তাকে খাওয়া-দাওয়াও করতে হয়। ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে শরিফাকে বলে, বুঝছেন নি দোস্তাইন, মতি মিয়া কানা নিবারণরে ফুল্লাইয়া খাইস কইরা রাখলাম।

শরিফাকে এই সংবাদে খুব উল্লাসিত মনে হয় না।

বর্ষার জন্যে অসুখ বিসুখ হতে শুরু করেছে।

পেট খারাপ, জ্বর অসুখ বলতে এই দুটিই। মানুষের হাতে টাকা আছে। কিছু হতেই ডাক্তারের ডাক পড়ে। কাজেই আমিন ডাক্তারের ভালো সময় যাওয়ার কথা। কিন্তু তা যাচ্ছে না। বর্ষার আগে আগে নতুন একজন ডাক্তার এসে পড়েছে।

এই অঞ্চলের লোকদের হাতে যখন টাকা-পয়সা থাকে তখন হঠাৎ করে শহুরে ডাক্তার এসে উদয় হয়। লোকদের টাকা পয়সা যখন কমে আসতে শুরু করে তখন বিদেয় হয়। আগেও এ রকম হয়েছে। এতে আমিন ডাক্তারের তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। সোহাগীর লোকজন পুরান ডাক্তারকেই ডাকে। কিন্তু এই বৎসর অসুবিধা হচ্ছে। নতুন যে ডাক্তার এসেছেন তিনি সোহাগীর লোকজনদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারটির নাম শেখ ফজলুল করিম।

এসেছেন মোহনগঞ্জ থেকে। সেখানে ডাক্তার সাহেবের বড় ফার্মেসি আছে 'শেখ ফার্মেসি।' ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যে এ্যাসিসটেন্ট এসেছে সে আরেক বিস্ময়, লোকটির বাড়ি জৌনপুরে। বাংলা বলতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সাহেবের ঘরের উঠোনে বসে সুর করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস পড়ে। ডাক্তার সাহেব নিজেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করেননি। তিনি সঙ্গে একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে ঘোড়া কি কাজে লাগবে জিজ্ঞেস করলে উচ্চস্বরে হেসে বলেছেন—শীতকালের জন্যে ঘোড়া আনা হয়েছে। তার মানে লোকটি শুধু বর্ষার সময়ের জন্যে আসেনি, দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মধুর স্বভাব। কদিন হয় এসেছেন, এর মধ্যেই গ্রামের সবার নামধাম জানেন। দেখা হলেই খোঁজ খবর করেন। অসুধের জন্য গেলে প্রথমেই বলেন- বিনা পয়সায় অষুধ দিতে পারি। কিন্তু অষুধে কাজ হবে না। পয়সা দিয়ে অষুধ নিলে তবেই অসুধ কাজ করে। গ্রামের সবার ধারণা কথাটি খুব 'নেহ্য'।

ডাক্তার সাহেবের কাছে সপ্তাহে একটি কাগজ আসে 'দেশের ডাক'। তিনি উচ্চস্বরে সেই কাগজ পড়ে শুনান। পড়া শেষ হলে চিন্তিত মুখে বলে- 'ইস দেশের সর্বনাশের আর বাকি নাই।' গ্রামের লোকজন সর্বনাশের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বিদ্যা বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়।

আমিন ডাক্তার মহাবিপদে পড়ে গেল। রুগী পত্তর একেবারেই নেই। পাওনা টাকা-পয়সাও কেউ দিচ্ছে না। সোহাগীর লোকজন যেন ভুলেই গেছে এই গ্রামে আমিন ডাক্তার নামে পুরান একজন ডাক্তার আছে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অনেক ফন্দি ফিকির করে। কোনোটাই কোনো কাজে আসে না। যেমন একদিন সকালে সেজে-গুজে গম্ভীর মুখে তার ব্যাগ হাতে বেরুল যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই বলল- নিয়তলী থেকে 'কল' এসেছে। রুগীর অবস্থা এখন তখন। আমিন ডাক্তারকে ছাড়া ভরসা পাচ্ছে না। বিশেষ করে নিয়তলীর কথা বলার কারণ হচ্ছে- নিয়তলীতে সিরাজুল ইসলামের মতো নামী ডাক্তার থাকেন।

আষাঢ় মাসের গোড়াতেই আমিন ডাক্তার মহামুসিবতে পড়ল।

না খেয়ে থাকার যোগাড়। একদিন চৌধুরী সাহেব এসে দেখেন আমিন ডাক্তার দুপুর বেলা শুকনো চিড়া চিবাচ্ছে। তিনি বড়ই অবাক হলেন। ভাটির দেশে ভাতের অভাব নাই আর এখন সময়টাই হচ্ছে ফেলে ছড়িয়ে খাবার। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোজগার পাতি কেমুন ডাক্তার?

ইয়ে আছে কোনো মতে।

হুঁ।

কলেরা শুরু হইলে কিছু বাড়ব। এখন কম।

চৌধুরী সাহেব যাবার আগে বলে গেল সে যেন অতি অবশ্যি আজ রাত থেকে দু'বেলা তার এখানে খায়। আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সন্ধ্যা বেলা সে গেল নতুন ডাক্তার শেখ ফজলুল করিম সাহেবের কাছে। 'দেশের ডাক' কাগজটি এসেছে। সেইটি পড়া হচ্ছে। প্রচুর লোকজন ঘরে। ফজলুল করিম সাহেব আমিন ডাক্তারকে খুব খাতির করলেন। আমিন ডাক্তার এক পর্যায়ে বলল, আপনের কাছে একটা পরামর্শের জইন্যে আসলাম ডাক্তার সাব।

কি পরামর্শ।

এই গ্রামে একটা ইস্কুল দিতাম চাই।

আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি ইস্কুল কি দিবেন?

ডাক্তারি আমি করতাম না। আমার চেয়ে ভালো ডাক্তার এখন এই গ্রামেই আছে।

লোকজনকে অবাক করে দিয়ে আমিন ডাক্তার উঠে পড়ল অনেক রাত্রে প্রথম খাবের মতো খেতে গেল চৌধুরী বাড়ি। ছোট চৌধুরী বসে ছিল বারান্দায়।

তার গায়ে একটি সুতাও নেই। আমিন ডাক্তারকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, এই শালা আমিন তরে আজই আমি খুন করবাম। শালা তুই আমারে দেইখ্যা হাসছস। শালা তর বাপের নাম আজই ভুলাইয়া দিয়াম।

৯

বর্ষার প্রধান প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

সোহাগীর চারপাশে বাঁশ পুঁতে চাইল্যা গাছ ঢুকিয়ে মাটি শক্ত করা হয়েছে। প্রবল হাওয়ায় যখন হাওরের পানি এসে আছড়ে পড়বে সোহাগীতে তখন যেন মাটি ভেঙে না পড়ে।

উত্তর বন্দ সবচে' নিচু। সেটি ডুবল সবার আগে। তারপর একদিন সকালে সোহাগীর লোকজন দেখল যেন মন্ত্রবলে চারদিক ডুবে গেছে। থৈ থৈ করছে জল। হুম হুম শব্দ উঠছে হাওরের দিক থেকে। জলপাই তিতার বাঁশ আর বেত বনে প্রবল হাওয়া এসে সারাক্ষণ বোঁ বোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলছে। চিরদিনের চেনা জায়গা হঠাৎ করে

যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে সবুজ রঙের ছোট্ট 'সোহাগী'। নাইওরীদের আসবার সময় হয়েছে।

গভীর রাত্রে হাওরের নৌকার যাত্রীরা কি কিছুই না শোনে। বিদেশী নায়ের মাঝিরাও সোহাগীর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে—

কোন গ্রাম? কো-ন গ্রা-া-া-ম?

সোহাগী, গ্রামের নাম সোহাগী।

চারদিকের অথই জলের মাঝখানে ছোট্ট গ্রামটি ভেসে থাকে। চৌধুরীবাড়ির লোকজন সাদা কেরোসিন তেলের হারিকেন জ্বালিয়ে সারারাত হিজল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গভীর রাত্রে যখন গ্রামের সব আলো নিভে যায় তখনো সেই আলো মিটমিট করে জ্বলে। দূর থেকে সেই আলো দেখে সোহাগীর নাইওরী মেয়েরা আহ্লাদে নৌকা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওই আমার বাপের দেশ ওই দেখা যায় চৌধুরীবাড়ির লণ্ঠন। গাঢ় আনন্দে তাদের চোখ ভিজে ওঠে।

ছেলেপুলেদের আনন্দের সীমা নেই। এখন বড়ই সুসময়। পানিতেই তাদের সারাদিন কাটে। এখন ডিঙি নৌকা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশিই হবে। পানির সঙ্গে পরিচয় হোক। একদিন এদেরকেই তো ঝড়ের রাত্রে একা একা হাওর পাড়ি দিতে হবে। আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির একটি অন্ধকার কোঠায় তার ইস্কুল সাজিয়ে বসে থাকে। প্রথম দিনে গোটা কুড়ি ছাত্র ছিল, এখন এসে ঠেকেছে দুই জনে। কানা চাচার ছোট ছেলে বাদশা মিয়া আর কৈবর্ত পাড়ার গণেশ। অন্য ছাত্ররা পড়ে থাকে হাওরের পানিতে। কার দায় পড়েছে আমিন ডাক্তারের অন্ধকার ঘরে বসে থাকার? দুটি ছাত্রকে নিয়েই আমিন ডাক্তার মহা উৎসাহে লেগে থাকে। বাদশা মিয়া বোকার হদ্দ। আমিন ডাক্তার যখন কয়ের উপর আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করে 'এইটা কি?' বাদশা মিয়া তখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে বলে 'স্বরে অ'। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড চড় লাগায় কিন্তু বাদশা মিয়ার বিদ্যার্জনের স্পৃহা সীমাহীন। সে পরদিন আবার শ্লেট পেনসিল নিয়ে হাজির হয়। অন্য দিকে গণেশের পড়াশোনায় খুব মন। তাকে পড়াতে বড় ভালো লাগে। কি চমৎকার, বলা মাত্রই সব শিখে ফেলে। দ্বিতীয়বার আর বলতে হয় না। কি সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা।

চৌধুরীবাড়ি খেতে যেতে এখন আর আগের মতো লজ্জা লাগে না। চৌধুরীদের পাগলা ছেলের কেউটা খুব যত্ন করে। পর্দার আড়াল থেকে মধুর স্বরে বলে, আরেকটু মাছ নেন চাচাজী।

আর না মা।

না চাচাজী নেন। আরেক টুকরা নেন।

তাকে মাছ নিতেই হয়।

ইচা মাছ আর চোলাইয়ের ভরকারি কোনোদিন খাইছেন চাচাজী?

না মা খাই নাই।

শুধু সুস্বাদ। আমার বাপের দেশে করে।

একদিন কইয়েরো।

'জ্বি আইচ্ছা।'

তোমার বাপের দেশ কোথায়?

বহুত দূর। গাঁয়ের নাম বেতসি। নবীনপুর ইউনিয়ন।

ভাটি অঞ্চল?

জী না, উজান দেশ।

খাওয়ার পর পান আসে। একটা কামলা এসে তামাক সাজিয়ে দিয়ে যায়। পর্দার আড়াল থেকে বৌটি বলে, পেট ভরছে, চাচাজী?

আলহামদুলিল্লাহ্, খুব খাইছি।

আপনের যেটা খাওনের ইচ্ছা হয় আমারে কইবেন।

বৌটিকে আমিন ডাক্তারের খুব দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চৌধুরীবাড়ির পর্দা বড় কঠিন পর্দা। দেখা হয় না। ভাত খেয়ে ফেরার পথে চৌধুরীর পাগল ছেলেটার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। ছেলেটি হুংকার দিচ্ছে, কেডা যায়? আমিন ডাক্তার? এই শুওরের বাচ্চা এদিকে আয় তো।

আমিন ডাক্তার না শুনার ভান করে এগিয়ে যায়। পাগলটা দারুণ হৈচৈ শুরু করে, এই শালা কথা কস না যে, এই শালা।

বৌটার কথা চিন্তা করে আমিন ডাক্তারের বড়ই খারাপ লাগে। রোজ ভাবে চৌধুরী সাহেবকে বলে ছেলেটিকে নিশান সাব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বলা আর হয় না।

ভাদ্র মাসে হঠাৎ মতি মিয়া ফিরে এল। তার গায়ে দামী একটা চাদর। মাথায় ঢেউ খেলান বাবড়ি চুল। হলুদ রঙের মটকার পাঞ্জাবিতে দুটি রুপার মেডেল ঝুলছে। মেডেল দুটির মধ্যে একটি সে সত্যি সত্যি পেয়েছে। কেরানীগঞ্জের এক বেপারী খুশি হয়ে দিয়েছে। মতি মিয়া এখন নাকি বড় গাতক।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে লোকজন ভিড় করে।

'মতি এই দুই গান বাজনা হইক। হুনলাম উজান দেশে তোমারে নইয়া কাড়াকাড়ি।'

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে।

গইলতা আইজ যুইত নাই। আইজ না।

বলামাত্রই এখন আর গানে টান দেয়া যায় না। বড় গাতকদের মান থাকে না তাতে। বড় গাতকদের গান সাধ্য সাধনা করে শুনতে হয়।

একখান গাও মতি ভাই।

কাইল যাই। নিজের বান্দা গান বানাইছি।

নিজে গান বান্দ? কও কি মতি ভাই?

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে। গ্রামের লোক বড়ই চমৎকৃত হয়।

কাইল কিন্তু বেবাক রাইত গান অইব, কি কও মতি ভাই?

চানি রাইত আছে। বেবাক রাইত গান। বুদ্ধিটা কেমুন?

দেখি।

চেষ্টাকৃত একটা গাম্ভীর্য বহু কষ্টে মতি মিয়াকে ধরে রাখতে হয়।

পরের রাতে মতি মিয়ার বাড়িতে কিন্তু কেউ আসে না ; কারণ সন্ধ্যার কিছু আগে কোনো খবর না দিয়ে কানা নিবারণ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে, আজ রাতটাই শুধু থাকবে। চৌধুরীদের আলায় বসেছে গানের আসর। ছেলে বুড়ো সব সন্ধ্যা থেকেই বসা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এক সময় কানা নিবারণ গানে টান দিল। গ্রাম্য দুঃখী মেয়ের চিরকালের গান। শ্রাবণ মাস চলে গিয়েছে ভাদ্র মাসও যায় যায়। তবুও তো নৌকা সাজিয়ে বাপের দেশ থেকে আমাকে কেউ নাইওর নিতে আসল না।

গানের মাঝখানে একটি অল্প বয়েসী বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেয়েটিকে এ বৎসর কেউ নিতে আসেনি। তাকে কাঁদতে দেখে অনেকেই চোখে আঁচল দিল। কিন্তু কানা নিবারণকে এই সব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে সমস্ত জাগতিক ব্যথা বেদনার ঊর্ধ্বে। ফকফকা জ্যোৎস্নায় গ্রামের সমস্ত দুঃখী বৌ-ঝিরা কানা নিবারণের মধ্য দিয়ে তাদের চিরকালের কান্না কাঁদতে লাগল,

'শ্রাবণ মাস গেছে গেছে ভাদ্র মাসও যায়
জানি না কি ভাবেতে আছে আমার বাপ ও মায়'

মতি মিয়া তার বাড়ির উঠোনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আজ রাতে সোহাগীর মানুষের আর তাকে প্রয়োজন নাই। রহিমা এক সময় এসে বলল ভাত দেই মতি ভাই?

নাহ ক্ষিদা নাই। তুমি গান শুনতে গেলা না?

রহিমা কথা বলল না। মতি মিয়া ধরা গলায় বলল, যাও কানা নিবারণের গান শুন গিয়া। বড় ওস্তাদ লোক। তার মতো গাতক আর হইত না।

মতি মিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সে দিন দশেক থাকবে ভেবে এসেছিল কিন্তু থাকল না। পরদিন ভোরেই শম্ভুগঞ্জ চলে গেল।

১০

জংলা ভিটায় এখন আর যাওয়া যায় না।

নাবাল জায়গা। আষাঢ় মাসের গোড়াতেই পানি উঠে গেছে। দক্ষিণ কান্দা দিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে জলমগ্ন ভিটার আশেপাশে যাওয়া গেলেও এখন আর কেউ যায় না। দক্ষিণ কান্দায় খুব সাপের উপদ্রব হয়েছে। সিরাজ মিয়ার একটি বকনা বাছুর সাপের হাতে মারা পড়েছে।

তবু নুরুদ্দীন জঙ্গলা ভিটায় যাবার জন্যে এক সকালে লালচাচির বাড়ি এসে উপস্থিত। লালচাচির খোন্দা নিয়ে সে যাবে জঙ্গলা ভিটায়। তার সঙ্গে গোটা দশেক 'সার বর্শি।' বর্শি গুটি পেতে দিয়েই সে চলে আসবে। লালচাচি চোখ কপালে তুলে বলল, তোর মাথাডা পুরা খারাপ নুরা। এই চিন্তা বাদ দে।

লালচাচি নুরুদ্দীনের কোনো যুক্তিই কানে তুলল না। ব্যাপারটিতে যে ভয়ের কিছুই নেই, খোন্দায় বসে থাকলে সাপ খোপ যে কিছুই করতে পারবে না লালচাচিকে তা বুঝান গেল না। লালচাচি খুব রেগে গেল, এক কথা একশবার কইস না নুরা। আমারে চেতাইস না। আমার মন মিজাজ ঠিক নেই।

তাঁর মন মেজাজ ঠিক নেই কথাটি খুব সত্যি। খবর শুনা যাচ্ছে সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করবে। মেয়ে নিমতলীর, নকিব খাঁর ছোট মেয়ে। সিরাজ মিয়াকেও দোষ দেয়া যায় না। যখন বিয়ে করে তখন সে কামলা মানুষ। সরকারবাড়ি জন খাটত। ছোট ঘরের মেয়ে ছাড়া কামলা মানুষের কাছে কে মেয়ে দিবে? সেই দিন আর এখন নেই। নতুন ঘর তুলেছে সিরাজ মিয়া। এই বৎসর টিনের ঘর দিবে। এক বান টিন কেনা হয়েছে।

এ ছাড়াও একটি কারণ আছে। সিরাজ মিয়ার এখনো কোনো ছেলে পুলে হয়নি। তিনটি বাচ্চা আঁতুড় ঘরে মারা গিয়েছে। অনেকের ধারণা সিরাজ মিয়ার বৌয়ের ওপর জ্বিনের আছর আছে। লক্ষণ সব সেই রকম। প্রথমত সে অত্যন্ত রূপসী। বাছ বিচারও নেই। ভর সন্ধ্যায় অনেকেই তাকে এলোচুলে ঘরে ফিরতে দেখেছে।

সিরাজ মিয়া অবশ্যি বিয়ের প্রসঙ্গে কিছুই বলে না। তবে তার হাব ভাব যেন কেমন কেমন। ইদানীং সে প্রায়ই নিমতলী যায়। নৌকা বাইচের ব্যাপারেই নাকি তার যাওয়া লাগে। কিন্তু সৌখিন নৌকা নিয়ে যাবার সময় কেউ কি নতুন শার্ট গায়ে দেয়?

লালচাচি নুরুদ্দীনকে বিকাল পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। যতবারই নুরুদ্দীন উঠতে চায় ততবারই সে তাকে টেনে ধরে বসায়। নতুন এই সমস্যায় কি করণীয় সেই ব্যাপারে পরামর্শ চায়। যেন নুরুদ্দীন খুব একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। নুরুদ্দীন বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলে, চাচারে পানি পড়া খাওয়াও।

পানি পড়ার কথা লালচাচির অনেক বার মনে হয়েছে কিন্তু এ গ্রামে পানি পড়া দেওয়ার লোক নেই। ভিন্ন গ্রাম থেকে আনতে হবে। লোক জানাজানির ভয়ও আছে। লালচাচি হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুই আইন্যা দিতে পারবি? সুখানপুকুরে একজন কবিরাজ হুনছি পানি পড়া দেয়।

আইচ্ছা।

একলা যাওন লাগব কিন্তুক।

আইচ্ছা।

কেউরে কওন যাইত না। কাকপক্ষীও যেন না জানে।

কেউ জানত না।

নুরুদ্দীনের বড় মায়া লাগে লালচাচির যে অকার বাচ্চা হবে তা সে জানত না। চোখ মুখ সাদা হয়ে গেছে হাত পা ভারি হয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়ে এখন যেন আরো সুন্দর দেখায়, শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছা হয়। লালচাচি বলল, হা কইরা কি দেখস?

তোমার বাচ্চা হইব চাচি?

কথার ঢং দেখো। চুপ থাক।

নুরুদ্দীন একবার শেষ চেষ্টা করে।

চাচী লেও না তোমারে খোন্দটা। যাইয়াম আর আইয়াম।

আইচ্ছা যা। সেইখানে আয় তর জংলা ভিটা। দিরং করিস না।

দিরং হইত না।

খেয়াঘাটে উঠবার মুখে নুরুদ্দীন দেখল সোহাগীর দল তাদের বাইচের নৌকা নিয়ে মহড়া দিতে বেরিয়েছে। সিরাজ চাচা মাথায় একটি লাল গামছা বেঁধে নৌকার আগায়। নৌকা ছুটছে তুফানের মতো। গানের কথা শুনা যাচ্ছে–

'ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম
ওগো ভাবিজান বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।'

এই বারের বাইচে দুইটি খাসি এবং একটি গরু দেয়া হয়েছে। আশে-পাশের সাতটি গ্রামের মধ্যে কম্পিটিশন। ভাব সাব যা দেখা যাচ্ছে এ বছরে সোহাগীর দল বোধ হয় জিতেই যাবে।

জংলা ভিটাকে আর চেনা যায় না। পানিতে ডুবে একাকার। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ। বাঁশের ঝোপ আরো যেন ঘন হয়েছে। চারদিক দিনমানেই অন্ধকার। জংলা ভিটা ডুবিয়ে পানি কেমন পাড়ের বাড়ি পর্যন্ত উঠেছে। খালের মাঝামাঝি ঘন জলজ ঘাস জন্মেছে। সেই সব ঠেলে খোলা নিয়ে এগোনই যায় না। নুরুদ্দীন ভেসে বেড়াতে লাগল। এক জায়গায় দেখা গেল চার পাঁচটি খইরকল গাছ। এখানে খইরকল গাছ আছে তা কোনোদিন তার চোখেই পড়েনি। থোকা থোকা খইরকল পেকে লাল টুক টুক করছে। কি আশ্চর্য! নুরুদ্দীন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

এই সময় অদ্ভুত একটি কাণ্ড হলো। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে খইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক এক সঙ্গে কা কা করে উঠে গেল। উত্তর দিকের ঘন বাঁশবনে হাওয়ার একটা দমকা ঝাপটা বিচিত্র একটি হা হু' শব্দ তুলল। তার পরপরই নুরুদ্দীন শুনল একটি অল্প বয়েসী মেয়ে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। এরে সঙ্গে চারদিক নিশ্চুপ। গাছের পাতাটিও নড়ে না। চারদিক সুনসান।

নুরুদ্দীন ভয় কাতর স্বরে বলল, 'কেডা গো কেডা?'

আর তখন তার চোখে পড়ল মধ্যা বাড়ির ভিটার কাছে যেখানে জল শ্যাওলায় ঘন সবুজ হয়ে আছে সেখানে মাথার চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মেয়েটি ভাসছে। অসম্ভব ফর্সা তার একটি হাত ছড়ানো। হাত ভর্তি গাঢ় রঙের চুড়ি। এই সময় প্রবল একটা বাতাস

এল ; মেয়েটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে পাগল নুরুদ্দীনের দিকে। যেন ডুব সাঁতার দিয়ে ধরতে আসছে তাকে।

আকাশ-পাতাল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল নুরুদ্দীন। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। চোখ গাঢ় রক্তবর্ণ। লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। আমিন ডাক্তার এসে যখন জিজ্ঞেস করল, কি হইছে নুরু?

নুরু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

কি হইছে ক দেহি নুরু?

ডর পাইছি চাচা।

কি দেখছস?

একটা মেয়ে মানুষ সাঁতার দিয়া আমারে ধরতে আইছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি।

প্রচণ্ড ঝড় হলো সেই রাত্রে। ঘন ঘন বিজলি চমকাতে লাগল। কাল্লচান খবর আনল নিমতলীর দোষ লাগা তালগাছে বজ্রপাত হয়েছে।

পরদিন আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে সারা দুপুর জংলা বাড়ির ভিটায় ঘুরে বেড়াল। কোথাও কিছু নেই। শ্বইরকল গাছগুলি দেখে সেই নুরুদ্দীনের মতোই অবাক হলো। উদ্ভান দেশের গাছ। ভাটি অঞ্চলে কখনো হয় না। গাছগুলিতে গাঢ় লাল রঙের ফল টুক টুক করছে। আমিন ডাক্তার আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করল জংলা বাড়ির ভিটা পানিতে ডুবে গেছে। কোনো বৎসর এ রকম হয় না।

সোহাগীতে রটে গেল পাগলা নুরা ভরা সন্ধ্যায় গিয়েছিল জংলা বাড়ির ভিটাতে। গিয়ে দেখে পরীর মতো একটা মেয়ে নেংটা হয়ে সাঁতার কাটছে। নুরাকে দেখে সেই মেয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডুব সাঁতার দিল।

নুরুদ্দীনের জ্বর সারতে দীর্ঘদিন লাগল। নিমতলীর পীর সাহেব নিজে এসে তাবিজ দিলেন। গৃহ বন্ধন করলেন। বার বার বলে গেলেন আর যেন কোনোদিন জংলা ভিটায় না যায়। জায়গাটাতে দোষ হয়েছে। নিমতলীর তালগাছে যে থাকত সে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জংলা ভিটায় এসে তার আশ্রয় নেয়া বিচিত্র না।

১১

সোহাগীতে পানি ঢুকছে এই ভয়াবহ খবরটি চৌধুরীদের পাগল ছেলে প্রথম টের পেল। তার রাতে ঘুম হয় না। বাংলা ঘরের বেঞ্চিতে বসে সিগারেট টানে এবং কোনো রকম শব্দ হলেই চেঁচায়– 'কেডা? চোর নাকি? এই চোর, এই চোর। এ্যাইও!' তার চেঁচামেচি চলে ভোর পর্যন্ত। ফজরের আজানের পর সে ঘুমাতে যায়। দুপুর পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

সেই রাত্রে সে উঠোনে পাটি পেতে শুয়েছিল এবং তার স্বভাব মতো চোর চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সমস্ত

উঠোনে থৈ থৈ পানি। শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। শেয়াল ডাকাডাকি করছে চারদিকে। সে প্রথম কয়েক মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারল না। তার নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেঁচাল 'কেডা চোর নাকি? এই শালা চোর? এ্যাইও!' তার পরমুহূর্তেই 'পানি আসে পানি আসে' বলে বিকট চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের ঘোড়াটি বিকৃত স্বরে চেঁচাতে শুরু করল। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের গোয়াল ঘরগুলি থেকে গরু ডাকতে লাগল। বেশির ভাগ মানুষ জেগে উঠল এই সময়। ছোট মসজিদের ইমাম সাহেব রাত সাড়ে তিনটায় আজান দিলেন। অসময়ের আজান মহা বিপদের সংকেত দেয়। লোকজনের ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সরকারবাড়ি থেকে সরকার সাহেব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোনলা বন্দুক থেকে চার বার ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল।

আমিন ডাক্তার যখন ঘর থেকে বেরুল তখন তার উঠানে প্রায় হাঁটু পানি। এই রকম অসম্ভব ব্যাপার সোহাগীর মানুষ কখনো দেখেনি। এদিক অঞ্চলে পানি এত দ্রুত কখনো বাড়ে না। আর বাড়লেও পানি এসে বাড়ির উঠোনে কখনো ঢুকে না। আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ি এসে দেখে ইতিমধ্যেই প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। একটি হ্যাজাক লাইট উঠোনের জলচৌকির উপর বসান। চৌধুরী সাহেব গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁক ডাক করছেন।

'মেয়েছেলেগুলিরে সরকার বাড়িত লইয়া যাও। গরু ছাগলের দড়ি কাট। জান বাঁচানির চেষ্টা করো। ভেন্দার মতো চাইয়া থাইকো না।'

আমিন ডাক্তার দৌড়াতে শুরু করল। মতি মিয়ার বাড়ি যাওয়া দরকার। পুরুষ মানুষ কেউ নেই সেখানে। পরিবানু সে রকম হাঁটা চলাও করতে পারে না। এতক্ষণ সে কথা মনেই হয়নি।

মতি মিয়ার বাড়ির উঠোনে অনেকখানি পানি। দক্ষিণ কান্দার একটি অংশ ভেঙে ভেঙে সর সর করে পানি ঢুকছে। উঠোনের বাঁ দিকটা নিচু। সেখানে জলের একটা প্রবল ঘূর্ণি উঠেছে। আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে ঢুকে বেশ অবাক হলো। রহিমা সব কিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে ফেলেছে। হাঁস মুরগি গরু ছাগল সমস্তই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চৌকির নিচে ইট দিয়ে অনেকখানি উঁচু করে তার ওপর ধান রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় একটি বড় পুঁটলায় রাখা হয়েছে। পরিবানু চৌকির এক কোণায় বসে বসে কাঁদছিল। আমিন ডাক্তার পরীর মুখে শুনল, এখন কান্দনের সময় না দোস্তাইন। সরকার বাড়িত যাওন লাগবো।

আমি কেমনে যাই?

নৌকার ব্যবস্থা করতাছি। এখন শরমের সময় না। হাতটা ধরেন দেহি।

সরকার বাড়ি কিন্তু যাওয়া গেল না। দক্ষিণ কান্দার ভাঙা অংশে জলের চাপ খুব বেশি। সরকার বাড়ি যেতে হলে ভাঙা জায়গাটা পেরুতে হয়। কৈবর্ত পাড়ার জেলেরা সবাই চলে এসেছে দক্ষিণ কান্দায়। অনেকগুলি কুপি জ্বলছে সেখানে। চাটাই বিছিয়ে

মেয়েরা সব উচ্চস্বরে কলরব করছে। শরিফাকে ওদের কাছে বসিয়ে রেখে আমিন ডাক্তার রহিমাকে আনতে গেল। রহিমা খুঁটি নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘরের ভেতরে কি যেন খুঁজছে। আমিন ডাক্তারকে দেখে সে শান্ত স্বরে বলল, আজরফ এই খানে থান বেচা টেকা লুকাইয়া রাখছে। পানি উঠলে সব নষ্ট হইবো।

আমিন ডাক্তার বেশ অবাক হলো, তোমারে কইছিলো যে এইখানে লুকাইছে? না।

তুমি জানলা কেমনে?

রহিমা জবাব দিল না। এক মনে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

ডাক্তার ভাই।

কি?

আপনে অনুফা আর নুরুদ্দীনরে লইয়া যান, আমার দিরং হইব।

অনুফা নুরুদ্দীনের সঙ্গে চৌকিতে বসে খোঁজাখুঁজি দেখছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, হগলে মিল্যা একসাথে যাইবার চাই।

খুঁটিতে বাঁধা টাকা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। রহিমা বলল, আপনার কাছে রাখেন ডাক্তার ভাই।

আমার কাছে কেন?

মেয়ে মাইনসের হাতে টেকা থাকন নাই। দোষ হয়।

দক্ষিণ কান্দায় তারা যখন পৌঁছল তখন পূর্ব দিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। কান্দার পশ্চিম পাশে অনেকগুলি জেলে মেয়ে মিলে খুব হৈ চৈ করছে। কৈবর্তদের একটি ছেলে দৌড়াদৌড়ি করছিল পা পিছলে নিচে পড়েছে, মাথায় চোট লেগে শক্ত মার লেগেছে। কৈবর্তদের প্রবীণ নরহরি দাস তামাক টানছে আর বলছে, শক্ত মাইর দেও। খুব শক্ত দেও। জামশা পাইছে!

আমিন ডাক্তার বলল, ও নুরা তোর মারে খুঁইজা বাইর কর, খবরদার কান্দার কিনারাত যাইস না। এক চড় দিয়া দাত ফালাইয়া দিয়াম।

নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে চক্ষের নিমেষে ছুটে গেল। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, কারবারটা দেখছনি রহিমা, না করলাম তো চেষ্টা করন চাই।

রহিমা মৃদুস্বরে বলল, আপনেরে একটা কথা কইতাম চাই।

কি কথা?

কথাডা আপনি বিস্তুক রাখবেন আমিন ভাই।

আমিন ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, কিষয়ডা কি?

অনুফারে নিশান সাব ডাক্তারের কাছে পাঠাইতাম চাই। হেই খানে ইস্কুল কলেজ আছে। লেহা পড়া শিখবো।

আইজ হঠাৎ এই কথা কি কও?

ডাক্তার ভাই পানি নামলে এই হাসের অবস্থা খুব খারাপ হইব। আমরারের দুইডা পেট চালানোর ক্ষ্যামতা থাকতো না।

তুমি তো অনেক দূরের কথা কও রহিমা।

নাহ্ ডাক্তার ভাই দূরের কথা না।

নিমক সাব ডাক্তারের কাছে নিলে খিরিস্টান হওন লাগে। হেই কথাডা জানতো আমি।

তুমি ফিরাডা এটু বেশি করতাছ রহিমা। এই পানি থাকব না। যেমন হঠাৎ আইছে হেই রকম হঠাৎ যাইবো।

ডাক্তার ভাই এই পানি মেলা দিন থাকব।

অন্দরের ঠিক মাঝখানে কারা যেন একটা আগুন করেছে। দুর্যোগের সময় মানুষ প্রথমে অকারণেই একটা আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে। আজকের এই আগুনের অবশ্যি প্রয়োজন ছিল। ভেজা গা শুকুতে হবে। তা ছাড়া বিলের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমিন ডাক্তার দেখল ফজলুল করিম সাহেব আগুনের কাছে এসে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। তাঁর ঘরের কাছেই সরকারবাড়ি।

এই যে ও ভাই আমিন ডাক্তার একি অবস্থা?

অবস্থাটা খারাপই, আপনি এতদূর আসলেন।

আমার ঘোড়ার খোঁজে আসছি। মরেই গেছে নাকি কি বিপদ দেখেন তো? পাইছেন ঘোড়া?

কই পাব বলেন? ছিঃ ছিঃ, মানুষ থাকে এইখানে?

নুরুদ্দীন আর অনুফা জারুল গাছের গুঁড়িতে চুপচাপ বসে আছে। গাছটি কান্দার ধার ঘেঁষে উঠেছে। নিচে তাকালেই পানির ঘোলা আবর্ত চোখে পড়ে। শরিফা বেশ কয়েকবার ডাকল, নুরু অত পানির ধারে যাইস না। কাছে আইস্যা ব।

নুরু শোনে না। ফিসফিস করে অনুফাকে কি যেন বলে। অনুফা খিলখিল করে হেসে উঠে। শরিফা ধমকে উঠে, হাসিস না। খবরদার। বিপদের মইধ্যে হাসি। কিছুই তর মায় তরে শিখায় নাই?

ভোরবেলা দেখা গেল পোষা পাখি কাক্কা ছুঁই ছুঁই করছে। সরকারি দালি মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছাব্বিশ সনের বানের লাহান লাগে গো।

কৈবর্তদের চারটি নৌকা জারুল গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে বাঁধা। আমিন ডাক্তার বেশ কয়েকবার বলেছে নৌকাতে করে সবাইকে সরকারবাড়িতে নিয়ে যেতে। সরকারবাড়ি অনেকখানি উঁচুতে। তাছাড়া পাকা দোতলা বাড়ি।

মেয়েছেলেরা সবাই দোতলায় থাকতে পারবে। কৈবর্তরা রাজি না। তারা দক্ষিণ কান্দাতেই থাকতে চায়।

সারা রাত ঝড় বৃষ্টি কিছুই হয়নি। সকাল বেলা দেখা গেল আকাশে ঘন কালো মেঘ। দুপুরের পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। নরহরি দাস চিন্তিত মুখে বার বার বলতে লাগল, গতিক খুব খারাপ। ভগবানের নাম নেন গো।

বিকালের দিকে বৃষ্টির চাপ কিছু কমতেই দেখা গেল ছোট ছোট খোকা নিয়ে সরকারবাড়ির কাজের লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার বাড়ির ছোট বৌ নাকি পানিতে পড়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল। রাত প্রথম প্রহর পুরাবার আগেই কান্দার উপর আধ হাত পানি উঠে গেল।

পানি থাকল সব মিলিয়ে ছ'দিন। এতেই সোহাগীর সর্বনাশ হয়ে গেল।

১২

ভাত না খেয়ে বাঁচার রহস্য সোহাগীর লোকজনের জানা নেই। চৈত্র মাসের দারুণ অভাবের সময়ও এরা ফেলে ছড়িয়ে তিন বেলা ভাত খায়। এবার কার্তিক মাসেই কারো ঘরে এক দানা চাল নেই। জমি ঠিক ঠাক করার সময় এসে গেছে, বীজ-ধান দরকার। হালের গরু দরকার। সিরাজ মিয়ার মত সম্পন্ন চাষিও তার তিন বাঁধা জোড় তিন হালের দামে বিক্রি করে দিল।

ঘরে ঘরে অভাব। ভেজা ধান শুকিয়ে যে চাল করা হয়েছে সে চালে উৎকট গন্ধ। পেটে সহ্য হয় না। মোহনগঞ্জ থেকে আটা এসেছে। আটার রুটি কারোর মুখে রুচে না। কেউ খেতে চায় না। নবীর কারবারীরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতে শুরু করল।

ঠিক এই সময় কলেরা দেখা দিল। প্রথম মারা গেল ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের কম্পাউন্ডারটি। রাতিগ মতো জোয়ান লোক। দু'দিনের মধ্যেই শেষ। তার পরদিনই একসঙ্গে পাঁচ জন অসুখে পড়ল। আমিন ডাক্তার দিশাহারা হয়ে পড়ল। অষুধ-পত্র নেই। খাবার নেই। কি ভাবে কি হবে?

রাতে ঘর বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। ওলাউঠার সময় খুবই দুঃসময়। তখন বাইরে বেরুলে রাত বিরাত বিকট কিছু চোখে পড়তে পারে। চোখে পড়লেই সর্বনাশ।

ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেব কলেরা শুরু হওয়ার চতুর্থ দিনে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিন ডাক্তারের কাছে অষুধপত্র নেই। নিয়তপুরের সিরাজুল ইসলামের কাছে লোক গিয়েছিল। তিনি আসলেন না। নিয়তপুরেও কলেরা লেগেছে। সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। তবে সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে। সোহাগীতে এখনও কেউ আসেনি। কেউ বোধ হয় নামও জানে না সোহাগীর।

পঞ্চম দিনে রহিমার ভেদ বমি শুরু হলো। আমিন ডাক্তার ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। করবার কিছু নেই। রুগীর পাশে বসে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিইবা করা যায়?

শরিফা রহিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে ছিল। নুরুদ্দীন অনুফার হাত ধরে বারান্দায় বসে ছিল। শরিফা ডুকরে কেঁদে উঠল, একি সর্বনাশ ডাক্তার।

আল্লাহর নাম নেন, আল্লাহ নিগাবান।

রহিমার শরীর খুবই খারাপ হলো মাঝরাতে। শরিফা ধরা গলায় বলল, কিছু খাইতে মন চায় ভইন?

নাহ্।

ভইন আমার উপরে রাগ রাইখো না।

না আমার রাগ নাই। তোমরার সাথে আমি সুখেই আছিলাম।

শরিফা হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। আমিন ডাক্তার উঠোনের চুলায় পানি সিদ্ধ করছিল। শরিফা বেরিয়ে এসে বলল, এরে নিখিল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে ভালা হইয়া যাইত।

সময় নাই গো ভাইন। সময়ের অনটন।

রহিমা মারা গেল শেষরাতে। অনুফাকে দেখে মনে হলো না সে খুব বিচলিত হয়েছে। আমিন ডাক্তার বলল, অনুফা বেটি সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল কর। সব জামা কাপড় পানির মইধ্যে সিদ্ধ করণ দরকার।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না। আমিন ডাক্তার অনুফার মাথায় পানি ঢালতে লাগল। অনুফা ফিসফিস করে বলল, চাচাজী নিখিল সাব ডাক্তার আইতাছে।

কি কস তুই বেটি।

নিখিল সাব ডাক্তার এই গেরামে আসতাছে।

সেই একরাতে সোহাগীতে মারা গেল ছয় জন। গ্রাম বন্ধন দেয়ার জন্য ফকির আনতে লোক গেছে। ফকির শুধু গ্রাম বন্ধনই দিবে না ওলাউঠাকে চালান করে দিবে অন্য গ্রামে। অমাবস্যার রাত্রি ছাড়া তা সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে আগামীকাল অমাবস্যা।

ফকির সাব সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন এসে পৌঁছলেন দুপুর বেলা। খবর পেয়ে আমিন ডাক্তার চৌধুরী বাড়ির ভাত ফেলে ছুটে এল।

ভালো আছ আমিন?

নিখিল সাব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন। বিস্ময়ের চোটে আমিন ডাক্তারের মুখে কথা ফুটল না। ডাক্তার নিখিল সাব চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আমরা নিমতলী গিয়েছিলাম সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে, কাজেই তোমাদের এখানে আসলাম। আমাদের আরেকটা টিম গেছে সুখান পুকুর। তোমাদের অবস্থা কি?

স্যার খুব খারাপ।

পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে তো লোকজন?

নিখিল সাব হাসতে লাগলেন যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

নিখিল সাব পৌঁছবার পর আর একটি মাত্র রুগী মারা গেল। কৈবর্ত পাড়ার নিদু গোসাই। এত অল্প সময়ে ওলাউঠাকে আয়ত্ব করার কৃতিত্বের সিংহভাগ পেল ধনু ফকির। ফকির সাব ওলাউঠাকে পশ্চিম দিকে চালান করেছেন। সেই কারণেই শেষ রুগীটা হয়েছে পশ্চিমের কৈবর্ত পাড়ায়।

নিখিল সাব ডাক্তার শুক্রবার চলে গেলেন। যাবার সঙ্গে অনুফাকে সঙ্গে করে নিয়ে

গেলেন। অনুফা কোনো রকম আপত্তি করল না। নিখিল সাব ডাক্তার বার বার জিজ্ঞেস করলেন, আমিন বলছে তোমার মায়ের ইচ্ছা ছিল তুমি আমার স্কুলে পড়, কি যেতে চাও?

অনুফা মাথা নাড়ল। সে যেতে চায়।

কাঁদবে না?

উঁহুঁ।

নাম কি তোমার?

অনুফা।

এত আস্তে বলছ কেন? আমাকে ভয় লাগছে?

উঁহুঁ।

নৌকা ছাড়ার ঠিক আগে আগে আমিন ডাক্তার চৌধুরীদের পাগল ছেলেটাকে ধরে এনে হাজির করল। যদি নিখিল সাব কোনো চিকিৎসা করতে পারে। নিখিল সাব জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম আপনার?

চৌধুরী জমির আলী।

কি অসুবিধা আপনার?

জ্বি না, কোনো অসুবিধা নাই।

রাত্রে ভালো ঘুম হয়?

জ্বি হয়।

অত্যন্ত শান্ত ভদ্র কথাবার্তা। নিখিল সাব ডাক্তার নৌকা ছেড়ে দিলেন। বড় গাঙের কাছাকাছি নৌকা আসতেই অনুফা বলল, নুরু ভাই খাড়াইয়া আছে ঐখানে।

নিখিল সাব অবাক হয়ে দেখলেন নুরুদ্দীন নামের শান্ত ছেলেটা সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। অত দূর আসলো কি করে?

নৌকা ভিড়াব? কথা বলবে?

নাহ্।

যে মেয়েটি সারাক্ষণের জন্য একবার কাঁদেনি সে এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

১৩

অভাবের কষ্ট বড় কষ্ট।

নুরুদ্দীনের মেটে ঘর এখন ভাতের কষ্ট লেগে থাকে। শরিফা প্রায়ই বলে, আজরফ টেকা-পয়সা লইয়া আসুক, দুই বেলা ভাত রানমু।

কোনো দিন আইব?

কবে যে আসবে তা শরিফাও জানে। কোনোই খোঁজ নেই। নুরুদ্দীন গয়নার নৌকায় রোজ দু বেলা খোঁজ করে। মাঝে মাঝে চলে যায় নাপিত চাচির বাড়ি।

দুপুরে কি রানছ চাচি? ভাত?

না রে। জাউ। খাবি জাউ? দেই এক বাটি?

নাহ।

নুরুদ্দীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, রাইতে ভাত হইবনি চাচি?

দূর, ভাত আছে দেশটার মইধ্যে?

ভাত খাওয়ানের ইচ্ছা হয় চাচি।

লালচাচি গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, চাইরডা চাউল ঘরে আছে। দিমু ফুটাইয়া?

অইচ্ছা দেও।

লালচাচি নুরুদ্দিনের কোলে বাচ্চা দিয়ে অল্প কিছু চাল বসায়।

বাচ্চাটা অসম্ভব রুগ্ন। ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। কিছুতেই তার কান্না সামলান যায় না। লালচাচি শান্ত স্বরে বলে, ভাতের কষ্ট বড় কষ্টরে নুরা।

হ।

নতুন ধান উঠলে এই কষ্ট মনে থাকত না।

নুরুদ্দীন খেতে বসে হাসিমুখে বলে, অনুফা তিন বেলা ভাত খায়। ঠিক না চাচি?

হুঁ।

ফালাইয়া ছড়াইয়া খায়। ঠিক না চাচি?

হুঁ। নিখল সাবের তো আর পয়সার অভাব নাই।

বিকালের দিকে নুরুদ্দীন তার মাছ মারার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়। বাড়ির পেছনের মজা খালটাতে গোটা দশেক লার বর্শি পাতা আছে। বর্শিগুলির মাথায় জ্যান্ত পুঁটি মাছ। পুঁটি মাছের প্রাণ বড় শক্ত প্রাণ, এই অবস্থাতেও সে দশ বার ঘণ্টা বেঁচে থাকে। নুরুদ্দীনের কাজ হচ্ছে পুঁটি মাছগুলি মরে গেল কি না তাই দেখা। মরে গেলে সেগুলি বদলে দিতে হয়। মাছ কিছু ধরা পড়ে না। [illegible] এই পরিশ্রম করলে রোজ দু'তিনটা মাছ ধরা পড়ত। নুরুদ্দীনের বড় ইচ্ছা করে হুক্কা টানায় খেতে—সাহসে কুলায় না। একটা ফর্সা হাতের ছবি চোখে ভাসে। হাত ভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। এত লাল চুড়ি হয় নাকি?

আমিন ডাক্তারের স্কুলে যাওয়াও নুরুদ্দীন বন্ধ করে দিয়েছে। সারা সকাল বসে বসে 'স্বরে অ স্বরে আ' করে চেঁচাতে খুব খারাপ লাগে। এর চেয়ে সরকারবাড়ির জল মহালের কাছে ঘুরাঘুরি করলে কত কি দেখা যায়। জল মহাল এই বছর মাছে ভর্তি। পর পর দুই বছর 'পাইল' করা হয়েছে। সাধারণত পানি বেশি হলে মাছ কমে যায়। এই বৎসর হয়েছে উল্টো। নরহরি দাশ বলেছে এত মাছ সে কোনো জল মহালে দেখেনি। নুরুদ্দীন সারা সকাল জল মহালের পাশে বসে থাকে। সরকারেরা মাছ ধরার খুব বড় আয়োজন করছেন এই বৎসর। তাদের ছোট জামাই আসবেন বলে শুনা যাচ্ছে। ছোট জামাই গান বাজনায় খুব উৎসাহী। জামাই আসলে নিশ্চয়ই কানা নিবারণকে আনা হবে। দু'বছর আগে তিনি যাত্রা গান আনিয়েছিলেন, বৈকুণ্ঠের দল। পালার নাম মীনা কুমারী। তিন রাত যাত্রা হয়েছিল। সেই তিন রাত সোহাগীর কারোর চোখে ঘুম ছিল না। ছোট জামাই

আসার খবর হলে সোহাগীতে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। এইবার তেমন হচ্ছে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গান বাজনার কথা ভাবতে ভালো লাগে না।

আজরফ ফিরল আশ্বিন মাসে। শরিফার ধারণা আজরফ খালি হাতে আসেনি। বেশ কিছু টাকা পয়সা নিয়ে এসেছে। তার ধান বিক্রির টাকা আমিন ডাক্তারের কাছে। শরিফা চেয়ে চিন্তে কিছু এনেছে। সেই টাকার প্রায় সবটাই রয়েছে, খরচ হয়নি। শরিফা ভেবেছিল আজরফ আসা মাত্র ধান-টান কিনবে। খাওয়ার কষ্ট দূর হবে। আজরফ সে রকম কিছুই করছে না। অন্য সবার মতো ঘুরাঘুরি করছে জল মহালে কাজ করবার জন্যে। একদিন শরিফা বলেই ফেলল, টেকা পয়সা কিছু আনছন?

ইঁ।

কত টেহা?

আছে কিছু।

ধান-টান কিছু কিনন দরকার। মুন্না ভাত খাইতে পারে না।

এই কয় দিন যখন গেছে বাকি দিনও যাইব।

জমা টেহা দিয়া তুই করবি কি?

জমি কিনবাম। অভাবের লাগিন হগ্গলে জমি বিক্রি হইতাছে।

আজরফ সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তাকে ভরসা করে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না। কখন কি করবে বাড়িতে কিছুই বলে না। আমিন ডাক্তার একদিন এসে বলল, 'আজরফ নৌকাডা তো খুব বালা কিনছে সোবহান।'

শরিফা আকাশ থেকে পড়েছে। নৌকা কেনার কথা সে কিছুই জানে না।

আজরফ তুই নি নাও কিনছস?

হ।

কই কিছু তো কস নাই।

কওনের কি আছে?

সরকারবাড়িতে আজরফ রোজ দু'বেলা করে যাচ্ছে যেন জল মহালের কাজের উপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। সরকারদের অনেক লোক দরকার। মাছ মোহনগঞ্জ নিয়ে পৌছান, নীলগঞ্জ নিয়ে যাওয়া, মাছ কাটা, মাছ শুকানো কাজের কি অন্ত আছে? কিন্তু কাজ পাওয়াটাই হচ্ছে সমস্যা। নিজাম সরকার সোহাগীর লোকদের কাজ না দিয়ে অন্য গ্রামের লোকদের কাজ দিচ্ছেন। এর পেছনে তাঁর একটি নিজস্ব যুক্তি আছে। অন্য গ্রামের লোকদের কাজের সময় একটা কড়া কথা বললে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নিজ গ্রামের লোকদের বেলা তা করা যাবে না। এদের সঙ্গে নিত্যদিন দেখা হবে। এরা যদি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখে সেটা খারাপ।

নিজাম সরকার অবশ্যি আজরফকে কাজ দিলেন। মাছের নৌকা নিয়ে নীলগঞ্জ যাওয়া।

রাইতে রওনা হইয়া সকালে টেইনের আগে নিয়া পৌছাইবা। পারবা তো?

পারবাম।

তোমারে দেইখ্যা অবশ্যি মনে হয় পারবা। তোমার বাপের বদ স্বভাব তোমার মইধ্যে নাই। তোমার বাপ আছে কই এখন?

ঢাকা জিলায়। নরসিংদি।

বুঝলা আজরফ, গরুর যে ও তারও একটা গুণ আছে। তোমার বাপের হেইডাও নাই।

আজরফের সঙ্গে আমিন ডাক্তারেরও চাকরি হয়। হিসাব পত্র রাখা। হিসাব রাখার জন্যে মোহনগঞ্জ থেকেও একজনকে আনা হয়েছে। সেই লোক অতিরিক্ত চালাক। আমিন ডাক্তারকে চাকরি দেয়ার সেটাও একটি কারণ। আমিন ডাক্তার এখন আর ডাক্তারি করে না। যদিও রুগী এখন প্রচুর। কিন্তু টাকা-পয়সা কেউ দিতে পারে না। অষুধ পর্যন্ত বাকিতে কিনতে হয়। আমিন ডাক্তারের অষুধের বাক্সও খালি। অষুধ কিনে জমিয়ে রাখবে সেই পয়সা কোথায়?

আমিন ডাক্তার এখনো খেতে যায় চৌধুরীবাড়ি। চৌধুরীবাড়ির খাওয়া আর আগের মতো নাই। সকাল বেলা রুটি হয়। রাতের বেলাতেই শুধু ভাত। বৌটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকে,

বড় শরম লাগে এই সব খাওয়াইতে।

না মা না শরমের কিছু নাই।

এখার অবস্থা আর আগের মতো নাই। জমি বিক্রি করতাছে।

কও কি মা'? খাস জমি?

লেচু বাগানটা বেচতাছে কিন্তু খাস জমিও যাইব।

কিনে কে সবগুলান?

জ্বি না। মতি মিয়ার ছেলে আজরফ, সেই রকম শুনতাছি।

বড়ই অবাক হয় আমিন ডাক্তার। সেই রাত্রেই মতি মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হয়।

আজরফ জমি কিনতাছ হুনলাম।

জ্বি চাচা।

কস কি রে বেটা।

সবটি টেকা একসাথে দিতাম পারতাম না। দুই বারে দিয়াম।

কত টেকা আছে তর, বেটা আজরফ?

আজরফ যেন শরিফা শুনতে না পায় সে ভাবে নিচু স্বরে টাকার অংকটা বলে। আমিন ডাক্তারের মুখ হা হয়ে যায়।

১৪

দীর্ঘ দিন মতি মিয়ার কোনো খোঁজ নাই।

শরিফার কান্নাকাটিতে আমিন ডাক্তার নরসিংদীর যাত্রা পার্টির অধিকারীকে একটি

চিঠি দিয়েছে। দশ দিনের মধ্যে তার উত্তর এসে হাজির। কি সর্বনাশ। মতি মিয়া নাকি তিনশ টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে। আমিন ডাক্তার চিঠির কথা চেপে গেল। শরিফার সঙ্গে দেখা হলেই মুখ কালো করে বলে—চিঠির উত্তর তো অখনো আইল না। বুঝলাম না বিষয়ডা।

শম্ভুগঞ্জেও চিঠি লেখা হয়। সেখান থেকেও উত্তর আসে না। কাজ কর্মে উজান দেশে যারা গিয়েছিল সবাই ফিরে এসেছে। মতি মিয়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। শরিফা খুব চিন্তিত। আজে বাজে স্বপ্ন দেখে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। সংসারের কাজ কর্মেও মন বসে না। তবুও যন্ত্রের মতো সব কাজ করতে হয়। আজরফ ভর দিয়ে চলার জন্যে লাঠি বানিয়ে দিয়েছে। সেইটি বগলের নিচে দিয়ে সে ভালোই চলাফেরা করতে পারে। রহিমা মারা যাওয়ায় এখন সে কিছুটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে। রাগারাগির জন্যেও হাতের কাছে একজন কেউ দরকার। আজরফ এমন ছেলে যাকে দশটা কথা বললে একটির উত্তর দেয়। তার বেশির ভাগ উত্তরই 'হা হুঁ' জাতীয়। আর নূরুদ্দীনের তো দেখাই পাওয়া যায় না। রাতের বেলাও সে মায়ের সঙ্গে ঘুমুতে আসে না। একা একা বাংলা ঘরে শোয়। এইটুকু ছেলের একা একা শোয়ার দরকারটা কি? কিন্তু শরিফার কথা কে শুনবে?

নীলগঞ্জে শনিবার হাট বসে। সেই হাটে মতি মিয়ার সঙ্গে নইম মাঝির হঠাৎ দেখা। নইম মাঝি বেশ কিছুক্ষণ চিনতেই পারেনি। হাত পা ফোলা ফোলা। মাথার সেই কোঁকড়ানো বাবড়ি চুল নেই। মুখ ভর্তি দাড়ি। খালি গায়ে একটা চায়ের স্টলের সামনে চুপচাপ বসে আছে।

কেডা মতি ভাই না?

মতি মিয়া মুখ ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, নইম নাকি। আরে এ মতি ভাই তুমি এইখানে করডা কি?

চা খাইলাম। দশটা চা বানায়।

শইলডা খারাপ নাকি মতি ভাই? তুমি না শম্ভুগঞ্জে আছিলা?

যাত্রার চাকরিডা নাই।

কর কি তুমি অখন?

করি না কিছু। গান বান্ধি।

বাড়িত যাইবা না? লও আমার সাথে, নাও লইয়া আইছি।

না।

অখন যাইতানা তো কোনো সময় যাইবা?

অখন এট্টু অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা, বাড়িতে বেবেই চিন্তা করতাছে।

মতি মিয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে থেমে থেমে বলল, একটা শাদি করছি নইম।

নইম মাঝির মুখে কথা সরে না। কও কি মতি মিয়া! করছ কবে?

মান খুই হইল।

তাজ্জব করলা তুমি মতি ভাই।

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, কেউরে হুনাইও না। তোমার আল্লাহর দোহাই।

নইম মাঝি কাউকে বলল না শুধু আজরফকে বলল।

পাঁচ কান করিস না আজরফ, নিজে গিয়া দেখ আগে। তর মারে হুনাইস না। মাইয়া মানুষ বেহুদা চিল্লাইব।

আজরফের কোনো ভাবান্তর হয় না। যথানিয়মে কাজকর্ম করে। তারপর একদিন বাঁশ আর চাটাই দিয়ে রহিমার ঘর ঠিক ঠাক করতে থাকে। শরিফার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি খুব রহস্যময় মনে হয়। হঠাৎ কাজ কর্ম ফেলে ঘরদুয়ার ঠিক করার দরকারটা কি? নুরুদ্দীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঘর ঠিক ঠাক করে যে বিষয়ডা কি?

আমি কি জানি?

তুই গিয়া জিগা।

তুমি জিগাও গিয়া আমার ঠেকা নাই।

শরিফার নিশ্চিত ধারণা হয় আজরফ সম্ভবত বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করতে চাওয়াটা দোষের কিছু না, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সময় অসময় আছে। চাইলেই তো আর বিয়ে দিয়ে দেয়া যায় না? দেশ জুড়ে আকাল; ঘরের মানুষটার কোনো খোঁজ নাই। টাকা পয়সা অবশ্যি আছে। ভালোই আছে; ধান বেচা টাকা, উজান দেশ থেকে নিয়ে আসা টাকা। এদিকে সরকাররাও নিশ্চয়ই ভালো দিচ্ছে। শকুর মতো যে খাটে তাকে দিবে না? কিন্তু টাকা থাকলেই বিয়ে করতে হবে?

শরিফা বড়ই চিন্তা বোধ করে। পরামর্শ করার লোক নেই। রহিমা থাকলে এই ঝামেলা হত না। একদিন নইম মাঝির বৌ এসে বলল, আজরফরে দেহি চৌধুরীবাড়ির কোণায় কোণায় ঘুরে। এট্টু খিয়াল রাইখ্যো।

কথা সত্যি হলে খুবই ভয়ের কথা। চৌধুরীবাড়ির কোনো মেয়েকে মনে ধরলেও তা মুখ ফুটে বলা উচিত না। শরিফা কায়দা করে জানতে চায় ব্যাপারটা। আজরফকে ভাত বেড়ে দিয়ে হঠাৎ বলে বসে, 'চৌধুরীবাড়ির মাইয়ার লাহান মাইয়া পাইলে বউ করতাম।'

আজরফ নিরুত্তর।

হুরনীর লাহান শইলের রঙ।

আজরফকে দেখে মনে হয় না সে কিছু শুনছে।

চৌধুরী বাড়ির ছোড মাইয়াডারে দেখছসনি আজরফ?

নাহ্।

শরিফার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয় তার। তারপর একদিন যখন আজরফ হঠাৎ ঘোষণা করে আগামীকাল ভোরে সে নুরুদ্দীনকে নিয়ে নীলগঞ্জে যাবে তার

বাবাকে আনন্দে তখন সন্দেহ ঘনীভূত হয়। হঠাৎ বাপের খোঁজ বের করে আশিখার জন্যে যাওয়া কেন? আর নুরুদ্দীনের জামাই বা নতুন গেঞ্জি কেনা হলো কেন?

নতুন গেঞ্জির দরকারটা কি ছিল?

মতি মিয়ার বৌটির নাম পরী।

মেয়েটির বয়স খুবই কম এবং বড়ই রোগা। কথা বলে উজান দেশের মানুষদের মতো টেনে টেনে। নুরুদ্দীন খুব অবাক হলো। সে ভাবতেও পারেনি এ রকম আশ্চর্য একটি ব্যাপার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরী নুরুদ্দীনের হাত ধরে তাকে পাশে বসাল এবং টেনে টেনে বলল, ছোড মিয়ার গালে একটা লাল তিল, দেখছনি কাও।

গালের লাল তিল যে একটি চোখে পড়ার জিনিস নুরুদ্দীন তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তার লজ্জা করতে লাগল।

চা খাইবা ছোড মিয়া? চা বানাই? নতুন খেজুর গুড়ের চা।

নুরুদ্দীনের মতো বাচ্চা ছেলেকে চা খাওয়াবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করে? তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে লজ্জিত মুখে চোখ ঘুরিয়ে ঘর বাড়ি দেখতে লাগল। দেখার মতো কিছু নেই। ছোট্ট এক চিলতে ঘর এক প্রান্তে দড়ির একটি খাটিয়ায় কাঁথা বালিশ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটি হারমোনিয়ামের উপর এক জোড়া ঘুঙুর। চা বানাতে বানাতে পরী বলল, নাচনিওয়ালী ছিলাম বুঝছনি ছোট মিয়া। হইলাম ঘরওয়ালী।

মতি মিয়া ধমক দিল, আহ্ কি কও?

ক্যান তোমার শরম লাগে?

পুরান কথার দরকারটা কি?

পরী খিলখিল করে হাসতে লাগল।

ফেরবার পথে মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে রইল। তাকে বড়ই চিন্তিত মনে হলো। কিন্তু পরীর ভাব ভঙ্গী খুব স্বাভাবিক। নৌকার অন্য প্রান্তে নুরুদ্দীনের সঙ্গে সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে, ঐটা কোন গ্রাম? ঘাসপোতা? ঘাসপোতা আবার কেমুন নাম?

ভাটি অঞ্চলে পানি কোন সময় হয়?

তোমারার জঙ্গলা বাড়ির ভিটাতে তুমি নাকি একটা পেত্নী দেখছিলা? হাতে লাল চুড়ি? কথা তা সত্য?

চৌধুরীবাড়ির একটা পুলার নাকি মাথা খারাপ?

কে ধনী বেশি? চৌধুরীরা না সরকাররা?

মতি মিয়া তেমন কোনো কথা-বার্তা বলল না। বড় গাঙ থেকে ছোট গাঙে নৌকা ঢুকবার সময় শুধু বলল, জমির কাজ-কাম শুরু করন দরকার।

আজরফ বলল, আপনে আর যাইতেন না শহুরে?

দূর গানবাজনা ছাড়ান দিছি। পোষায় না।

আজরফ কিছু বলল না। মতি মিয়া নিজের মনেই বলল, ঘর সংসার দেখন দরকার। গান বাজনায় কি পেট ভরে? ভাত কাপড়ডা আগে, বুঝছস?

নৌকা সোহাগীর কাছাকাছি আসতেই মতি মিয়া উসখুস করতে লাগল। 'আমরা যে আসতাছি তর মায় জানে।'

নাহ্।

কিছুই কয় নাই?

নাহ্।

মাবুদে এলাহী, বড় চিন্তার কথা আজরফ। কামডা ঠিক হইল না। আমি ভাবছি তর মা বোধ হয় নেওনের লাগি পাঠাইছে।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে তামাক টানতে লাগল। নৌকা ঘাটে আসা মাত্র আজরফকে বলল– আমিন ডাক্তারের সাথে একটা জরুরি কথা আছিল। কথাডা সাইরা আইতাছি, তরা বাড়িত যা। আজরফ কিছু বলার আগেই মতি মিয়া সরকারবাড়ির আমবাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শরিফার স্তম্ভিত ভাব কেটে যেতেই সে চেঁচাতে শুরু করল। সন্ধ্যাবেলাটা কাজ কর্মের সময়, তবু তার চিৎকারে ভিড় জমে গেল। এমন ব্যাপার সোহাগীতে বহু দিন হয়নি। মতি মিয়া কোত্থেকে এক মেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই মাগীর লজ্জা-শরম কিছু নেই, ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। শরিফার চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে তার সন্ধ্যায় ঘাটে পা ধুতে গেল। হারিকেন হাতে তার পিছু পিছু গেল নুরুদ্দীন। খালের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বলল, আমারে না দেখলে চিল্লানিটা কিছু কমব, কি কও নুরুদ্দীন?

চিৎকার অবশ্য কমল না। পরী ফিরে এসে দেখে শরিফা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। নইম মাঝির বউ তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। পরী বলল, এখন চিল্লাইয়া তো কোনো লাভ নাই। চিল্লাইলে কি হইব কন আপনে? আমি এই খানেই থাকবাম। আমার যাওনের জায়গা নাই।

শরিফা পর পর দুদিন না খেয়ে থাকল। খুন খুন করে কাঁদল পাঁচদিন। তারপর খরে পড়ে গেল। এই সময় পরী সম্পর্কে তার ধারণা হলো মেয়েটি খারাপ না। মতি মিয়ার মতো একটি অপদার্থের হাতে কেন পড়ল কে জানে।

নুরুদ্দীনকে এখন আর লালচাচির কাছে ভাত খেতে যেতে হয় না। পরী শুধুমাত্র নুরুদ্দীনের জন্যেই ভাতের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্যি লালচাচি কিছুদিন হলো বাচ্চা রেখে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি। সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করেছে। এই বৌটি বোকাসোকা। বড় আদর করে লালচাচির ছেলেকে। ছেলেটি তবুও রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে। এই বৌটি নুরুদ্দীনকে খুব আদর করে। নুরুদ্দীনকে দেখলেই বলে, 'নাড়ু খাইবা? তিলের নাড়ু আছে।'

নুরুদ্দীন না বললেও সে এসে দিবে। কাজ কর্মে সে নানচাচির চেয়েও আনাড়ি। এই বৌটিকেও নুরুদ্দীনের খুব ভালো লাগে।

১৫

সরকার বাড়ির জল মহালে মাছ মারবার জন্য একদিন সকালে এক দল কৈবর্ত এসে হাজির। সর্বমোট সাতটি নৌকার বিরাট একটি বহর। স্থানীয় কৈবর্তরা ধারণাও করতে পারেনি বাইরের জেলেদের মাছ মারার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় কৈবর্তদের প্রধান নরহরি দাস ছুটে এলো। নিজাম সরকার গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরার কাছে মাছ ধরার বড় জালই নাই। তোমরা মহালের মাছ ধরবা কি দিয়া?

এইডা কি কথা কইলেন সরকার সাব। মাছ ধরাই আমরার কাম আর জাল থাকত না? আসল কথাডা কি চৌধুরী সাব?

আসল কথা নকল কথা কিছু নাই নরহরি। নিজ গেরামের লোক দিয়া আমি কাম করাইতাম না।

আমরা দোষটা কি করলাম? সারা বছর জল মহালের দেখ-শোন করলাম। এখন পুলাপান লইয়া কই যাই?

নরহরি দাস হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিদেশী কৈবর্ত দলটি রাতারাতি জল মহালের পার্শ্বে ঘর-বাড়ি তুলে ফেলল। গাবের কষে জাল ভিজিয়ে প্রকাণ্ড সব জাল রোদে শুকাতে লাগল। ওদের মেয়েরা উদোম গায়ে শিশুদের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এমন ভাবে হাঁটা চলা করতে লাগল যেন এই জায়গায় তারা দীর্ঘ দিন ধরে আছে। রাতারাতি নতুন বসতি তৈরি হলো। হাঁস মুরগি চরছে। গরু জোয়াল হচ্ছে। সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে গান বাজনার আয়োজন হলো। ঢোল বাজতে লাগল মধ্যরাত পর্যন্ত।

নরহরি দাস তাদের সঙ্গে আলাপ করে সুবিধা করতে পারল না। সরকারবাড়ির সঙ্গে নরহরির কি কথা হয়েছিল তা তারা জানতে চায় না। তাদের চার মাসের কড়ারে আনা হয়েছে। মাছের তিন ভাগ নিয়ে মাছ ধরে দিবে এইটিই একমাত্র কথা। নরহরির যদি কিছু বলবার থাকে তাহলে তা সরকারবাড়ির সঙ্গেই হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে নয়।

মঙ্গলবার সকাল বেলা কৈবর্তদের কুমারী মেয়েরা এলোচুলে জল মহালে নেমে পূজা দিল। পূজার ফলস্বরূপ অসংখ্য মাছ ধরা পড়বে। মাছ মারায় কোনো রকম বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। প্রথম যে মাছটি ধরা পড়ল সেটি একটি দৈত্যাকৃতি কাতল। ডালায় সিঁদুর, ফুল এবং কাতলটি সাজিয়ে পাঠান হলো সরকার বাড়ি। ঘন ঘন উলু পড়তে লাগল নতুন কৈবর্ত পাড়ায়।

মাছ মারা শুরু হয়েছে পুরাদমে। মাছ-খোলার পাশে একটি চালা ঘর তোলা হয়েছে। আমিন ডাক্তার সেখানে খাতা পেন্সিল নিয়ে সারা দিন বসে থাকে। কৈবর্তরা চিৎকার করে হিসাব মিলায়।

এক কুড়ি-এক

দুই কুড়ি-দুই

তিন কুড়ি-তিন

রাখ তিন। রাখ তিন। রাখ তিন।

চার কুড়ি-চার

পাঁচ কুড়ি-পাঁচ

ছয় কুড়ি-ছয়

রাখ ছয়। রাখ ছয়। রাখ ছয়।

আমিন ডাক্তারের ব্যস্ততার সীমা নেই। কত মাছ ধরা পড়ল, কত গেল, আর কত মাছ পাঠান হলো খোলায়-সহজ হিসেব নয়। নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা চৌধুরীবাড়ির মতো নয়। খাবার দেয়া হয় বাংলা ঘরে। একটি কামলা এসে ভাত দিয়ে যায়। মোটা চালের ভাত আর খেসাড়ির ডাল। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে না। এই ব্যবস্থা আমিন ডাক্তারের ভালো লাগে। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য রাখছে জানলে তৃপ্তি করে খাওয়া যায় না। এখানে সে ঝামেলা নেই। নিশ্চিত মনে খাওয়া যায়। তবুও প্রতিবারেই খেতে বসার সময় চৌধুরীবাড়ির কথা মনে পড়ে।

শেষ দিন যখন খেতে গেল তখন খুব ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। মাঝখানে চৌধুরীসাহেব এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন।

শেষ কয়টা দিন তোমার কষ্ট হইল ডাক্তার, সময়টা আমার খারাপ পড়ছে, কি আর করবা কও

না না চৌধুরী সাব কি কন আপনি?

কোনোদিন চিন্তাও করছি না আমার বাড়ির অতিথ চাইর পদের নিচে খানা খাইব।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ থেকেই চলে গেলেন। খাওয়া দাওয়ার শেষে বৌটি যথারীতি মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে ডাক্তার চাচা?

আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল, খুব খাইছি মা।

বসেন, পান আনতে গেছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অনেক ভদ্রলোক দেখছি মা এই জীবনে, কিন্তু চৌধুরীর মতো ভদ্রলোক দেখলাম না।

বৌটি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আমিন ডাক্তার যখন চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন শান্ত গলায় বলল, ডাক্তার চাচা, আমার বিয়ার সময় এরা কিছু কয় নাই ছেলেটা পাগল। ছয় বৎসর বিয়া হইছে কিন্তু আমারে বাপের বাড়িত যাইতে দেয় না। আমার বাপ-চাচা গরিব মানুষ। তারা কি করব কন?

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৌটি মনে হলো কাঁদছে।

আমিন ডাক্তার হেসে হেসে বলল, যা আমি পাস্‌ মনে দোয়া করতাছি, হেকেটা ভালা হইয়া যাইব। মাথার দোষ থাকত না। তুমি দেখবা, নিজেই দেখবা।

ঘর থেকে বেরুবার পর পরই পাগল চেঁচাতে লাগল, এই শালা আমিন চোরা তরে আইজ খুন কইরা ফাঁসি যাইয়াম। শালা তর একদিন কি আমার একদিন।

আমিন ডাক্তার জুম্মাঘরে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে আজরফ বসে আছে।

কিরে আজরফ কোনো খবর আছে?

জ্বি না চাচা। বাজান আবার গেছে গিয়া।

কস কি? কই গেছে?

জানি না।

আজরফ চলে যাবার জন্যে ওঠে দাঁড়াতেই আমিন ডাক্তার দেখল আজরফের চোখ ভেজা।

বিষয় কি আজরফ কি হইছে?

জমি কিনার লাগিন যে টেকা-পয়সা আছিল হেইডা সব লইয়া গেছে। পাতিলের মইধ্যে আছিল।

কান্দিস না আজরফ। বেডা মাইনষের কান্দন ঠিক না, চউখ মোছ।

আজরফ সার্টের হাতায় চোখ মুছল।

১৬

নুরুদ্দীনের লার বর্শিতে প্রকাণ্ড একটি কই মাছ ধরা পড়েছে। লার বর্শিগুলিতে বোয়াল মাছ ছাড়া অন্য কিছু ধরা পড়ে না। এই কই মাছটার মতো দিশা হয়েছিল। খালের পাশে প্রচণ্ড লাফালাফি করে পরী [illegible] দেখে এই কাণ্ড। [illegible] ধরে না। লার বর্শির টুইন সুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে না কেন সেও এক রহস্য। হৈচৈ শুনে শরিফা বেরিয়ে আসল। চোখ কপালে তুলে বলল, মাছ কই পাইছস, এই নুরা?

নুরুদ্দীন হাঁপাচ্ছে, কথা বলার শক্তি নেই।

এই ছেরা, মাছ কই পাইছস?

বরশি দিয়া ধরলাম।

এই মাছ তুই বরশি দিয়া ধরছস? কি কস তুই?

নুরুদ্দীন জবাব দিল না।

পরী হাসি মুখে বলল, আইজ খুব ভালা খানা করবাম। আজরফরে কইয়াম চাইরডা পুলাউয়ের চাইল আনত। কি কস নুরা?

নুরুদ্দীন সব কয়টি দাঁত বের করে হাসে। শরিফা গলা উঁচিয়ে ডাকে, আজরফ ও আজরফ উইঠ্যা আয়।

আজরফ সারা রাত নৌকা চালিয়ে মাছ নিয়ে যায় নীলগঞ্জে। দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমায়। ডাকাডাকি শুনে সে বাইরে এসে অবাক— এত বড় মাছ কই পাইছস নুরা?

পায় করশি নিয়া ধরছি।

কস কি নুরুদ্দীন!

পরী হাসতে হাসতে বলল— মাস্টার কপালে মিছা লিখা ছিল বুঝছ আজরফ? এখন যাও কিছু ভালা-মন্দ রান্ধনের জোগাড় কর। চাইরডা পোলাওয়ের চাইল আনতা পারবা?

আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, মাছটা নীলগঞ্জে লইয়া যাইয়াম। পনেরো টেহা দাম হইবো মাস্টার।

নুরুদ্দীন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, এই মাছ আমি বেচতাম না ভাইসাব?

আমরা অত বড় মাছ দিয়া কি করবাম? বেকুবের মতো কথা কস। ঘরে একটা পয়সা নাই।

কানকোয় দড়ি বেঁধে আজরফ মাছ ঘাটের পানিতে ছেড়ে রাখল। নৌকা ছাড়বে আছরের ওয়াক্তে। ততক্ষণ পানায় মাছ জিইয়ে রাখা। নুরুদ্দীন কোনো কথা বলল না। আজরফ আবার যখন কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে তখন নুরুদ্দীন চাপা স্বরে বলল, ভাইসাব মাছ আমি বেচতাম না।

আজরফ বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম। এক কথা একশবার কস।

আজরফ আছরের আগে মাছ আনতে গিয়ে দেখে খুঁটিতে বাঁধা মাছ নেই। নুরুদ্দীনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটিতে পরীর হাত আছে বুঝাই যাচ্ছে। আজরফ লক্ষ্য করল, পরী মুখ টিপে হাসছে। আজরফ নীলগঞ্জে যাবার জন্যে যখন তৈরি হচ্ছে তখন পরী বলল, কয়েকটা টেকা থুইয়া যাও আজরফ, পোলাপান মাইনষের সখ।

আজরফ কথার উত্তর না দিয়ে বের হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল বালিশের উপর পাঁচ টাকার একটি নোট।

আমিন ডাক্তার দীর্ঘদিন পর আজ ডাক্তারি করে আসল। রুগী নয়া কৈবর্ত পাড়ায়। উত্থান শক্তি নেই এক বুড়ি। দু'দিন ধরে প্রবল জ্বর। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। আমিন ডাক্তার গিয়ে দেখে বুড়ির যত্নের সীমা নেই। গোটা কৈবর্ত পাড়াই বুড়িকে ঘিরে আছে। একজন পায়ের পাতায় প্রাণপণে তেল মালিশ করছে, অন্য একজন তালপাখা দিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া করছে। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড ধমক দিল পাখাওয়ালা ছেলেটিকে।

নিউমোনিয়া বানাইতে চাস নাকি অ্যাঁ?

আমিন ডাক্তার তার ব্যাগ খুলে লাল রঙের দুটি বড়ি পানিতে গুলে খাইয়ে দিল। অষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক বুড়ি চোখ মেলল দেখতে দেখতে।

কেডা গো?

এইনা আমিন ডাক্তার। এই দিগরে হেঁগার মতো ডাক্তার নাই।

বুড়ি ক্ষীণ স্বরে বলল, ডাক্তার সাবেরে শইরত দ্যা খাওয়া?

ওষুধের দাম বাবদ একটাকা ছাড়াও আর পাঁচটা টাকা তারা রাখল আমিন ডাক্তারের সামনে। আমিন ডাক্তার অবাক।

এক টাকা ভিজিট আমার।

ডাক্তার সাব রুগীর নিজের টাকা। সে আপনেরে দিতে চায়। কাইল সকালে আরেকবার আইস্যা দেখন লাগবো।

না কইলেও আসতাম। রুগীর একটা বিহিত না হইলে কি আর ডাক্তারের ছুটি আছে? ডাক্তারি সোজা জিনিস?

হৃষ্ট চিত্তে বাড়ির পথ ধরল আমিন। পিছে পিছে একজন আসল হারিকেন নিয়ে। যার যা কাজ সেটা না করলে কি আর ভালো লাগে? না ডাক্তারিটা আবার শুরু করতে হয়। ওষুধ পত্র কেনার জন্যে মোহনগঞ্জ যেতে হবে। এবার নিখল সরকারকে একটা চিঠি দিলে কেমন হয়? ডাক্তারের সাথে ডাক্তারের যোগ তো থাকাই লাগে। অনুফার একটা খোঁজও নেওয়া দরকার। কেমন আছে মেয়েটা কে জানে?

আমিন ডাক্তারের বাড়ির উঠোনে গুটি শুটি মেরে কে যেন বসে আছে। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কেডা এই খানে?

আমিন চাচা, আমি।

তুই অত রাইতে কি করস?

নুরুদ্দীন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্দস ক্যান? কি হইছে?

আমারে গয়াটা রাইখ্যা দিছে।

কি রাইখ্যা দিছে?

মাছ।

আমিন ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারল না। হারিকেনের আলোয় দেখল নুরুর সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। বাম গাল ডালিমের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

এই নুরা কি হইছে।

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

আয় ভিতরে আইস্যা ক দেহি কি হইছে। কান্দিস না।

ঘটনাটি এ রকম। নুরুদ্দীন তার রুই মাছ নিয়ে দক্ষিণ কান্দায় উঠতেই নিজাম সরকার তাকে দেখতে পান। নিজাম সরকারের ধারণা হয় মাছটা গত রাত্রে মাছ খোলা থেকে চুরি করা। এত বড় একটা মাছ (তাও রুই মাছ) লার বর্শিতে ধরা পড়েছে এটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার ওপর নুরুদ্দীন সারাক্ষণই জল মহালের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরাঘুরি করে।

নিজাম সরকার নুরুদ্দীনকে ধরে নিয়ে যান মক্তব খোলায়। মাছ চুরিতে কারা কারা

আছে তা জানবার জন্যে মন্ত্রের বাইরে মারধোর করা হয়। মারের জন্যে নুরুদ্দীনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাছটি ফেরত পাবার আশাতেই সে বিকাল থেকে আমিন ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, যা বাড়িত যা, আমি সরকারবাড়িত যাইতাছি।

মাছটা আরা দিব আমিন চাচা?

নিশ্চয়। না দিয়া উপায় আছে? কান্দিস না। বাড়িত যা।

এই খানে বইয়া থাকি চাচা, আপনে মাছটা লইয়া আইবেন।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের কথা শুনে বিরক্ত হলেন। একি ঝামেলা! তামাক টানা বন্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, চোরের যে সাক্ষী হেও চোর এইটা জান ডাক্তার? সরকার সাব নুরু চুরি করে নাই।

চুরি করছে না তুমি নিজে দেখছো?

আমিন থেমে থেমে বললো, সরকার সাব চুরি যে নুরু করছে, হেইডাওতো আপনে দেখেন নাই।

নিজাম সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, বাড়িত যাও ডাক্তার।

সরকার সাব একটা বড় অন্যায় হইছে, অন্যায়টার বিহিত হওন দরকার।

তুমি বড় ঝামেলা করতাছ। যাও বাড়িত গিয়ে ঘুমাও। সকালে আইস্যা তোমার সাথে কথা আছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অন্যায়ের বিহিত না হওন পর্যন্ত আমি যাইতাম না।

কি করবা তুমি?

আপনের বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মইধ্যে বইয়া থাকতাম।

যাও থাক গিয়া।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। ছোটলোকরা বড় বেশি আসকারা পেয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে এই সব বন্ধ করতে হবে। এশার নামাজের পর উঠানে এসে দেখেন আমিন ডাক্তার সত্যি সত্যি বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে। চৌধুরীদের পাগলা ছেলেটাও আছে সেখানে। সে ক্ষণে ক্ষণে চেঁচাচ্ছে, চোরের গুষ্টি বিনাশ করন খুব বেশি দরকার। চৌধুরীবাড়ির কামলারা এসে পাগলটাকে ধরে নিয়ে গেল।

নইম মাঝির বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত টুয়েন্টিনাইন খেলা হয়। নইম মাঝি মাঝরাতে খেলা ফেলে দেখতে গেল আমিন ডাক্তারের ব্যাপারটা কত দূর সত্যি। হ্যাঁ আমিন ডাক্তার বসে আছে ঠিকই। তার গায়ে লাল রঙের কোট। কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলেই মাথার উপর জাতি দেওয়া হয়েছে।

সত্যি সত্যি বাড়িত যাইতা না ডাক্তার ভাই?

নাহ।

জাড় পড়ছে খুব। বিড়ি খাইবা? চান বিড়ি আছে।

দেও দেখি।

বিড়ি ধরিয়ে নইম মাঝি শান্ত স্বরে বলল, 'ডাক্তার ভাই বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও। শীতের মইধ্যে বইয়া থাইক্যা লাভটা কি কও?'

আমিন ডাক্তার কিছু বলল না।

হঠাৎ বিড়ির লালচে আভাতে নইম মাঝি লক্ষ্য করল, আমিন ডাক্তার কাঁদছে। সে বড়ই অবাক হলো। নইম মাঝি সেই রাতে আর বাড়ি ফিরল না। শশা কৈবর্ত পাড়ায় প্রতি রাতেই ঢোল বাজিয়ে গান বাজনা হয়। আজ আর হলো না।

১৭

নিজাম সরকার কল্পনাও করেননি ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। একটা আধা পাগলা লোক বাড়ির সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকলে কার কি যায় আসে?

কিন্তু নিজাম সরকার ফজরের নামাজ শেষ করে বারান্দায় এসে দেখেন আমবাগানে দশ বার জন লোক জটলা পাকাচ্ছে। আমিন ডাক্তারের পা ঘেঁষে বসে আছে নইম মাঝি। নইম মাঝি নিজাম সরকারকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসসালামালিকুম সরকার সাব।

নিজাম সরকার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। নামাজের পর তিনি উঠোনে বসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শরীফ পড়েন। আজ পড়তে পারলেন না। হনহন করে এগিয়ে গেলেন আমিন ডাক্তারের দিকে।

নইম মাঝি সরকার সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল কিন্তু আমিন ডাক্তার বসে রইল। বহু কষ্টে রাগ সামলালেন নিজাম সরকার। থমথমে গলায় বললেন, তুমি এই খানে কি কর নইম? বেহুদা ঝামেলা করতাছ তোমরা। আমি থানাতে খবর দিয়াম। যাও বাড়িত যাও।

আইচ্ছা।

নইম মাঝি কিন্তু বাড়ি গেল না। আমিন ডাক্তারের পাশে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

জাল মহালে গিয়ে সরকার সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। মাছ মারার কোনো আয়োজন নেই। জেলেরা ছেলে মেয়ে নিয়ে রোদ তাপাচ্ছে।

এই বিষয় কি? আইজ কাজ কাম নাই?

কৈবর্তদের মুরব্বি ধীরেন্দ্র হাতজোড় করে এগিয়ে আসল।

এই ধীরেন কি হইছে?

আমরারে কইছে আইজ মাছ মারা হইত না।

কে কইছে।

ধীরেন্দ্র নিরুত্তর।

বল, কে কইছে।

হাশেম সাব কইছেন।

হাশেম সাব? ডাক তো হাশেম সাবরে দেখি বিষয়ডা কি?

হাশেম সাব আমিন ডাক্তারের সঙ্গে আছেন হিসাব রাখে। লোকটি মহা ধুরন্ধর। এসেই অবাক হয়ে বলল, আমি আবার কোন সময় কইলাম। ফাইজলামির জায়গা পাও না? যত ছোটলোকের দল। যাও কামে যাও।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি জমি তৈরির কাজে সবার ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু সোহাগীর লোকজন সেদিন কেউ কাজে গেল না। সরকারবাড়ির আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। দুপুর বেলা আসলেন চৌধুরী সাহেব। গম্ভীর হয়ে বললেন, ঝামেলাটা মিটাইয়া ফেল নিজাম। লোকটা না খাইয়া আছে।

কি করতে কন আমারে?

মহাশূল থাইক্যা একটা বড় মাছ ধইরা মতি মিয়ার বাড়িত পাঠাইয়া দেও। একটা মাছে তোমার কিছু যাইত আইত না।

চৌধুরী সাব নরম হইলে গাঁও গেরামে থাকন যায় না। আইজ একটা মাছ দিলে কাইল দেওন লাগব দশটা।

লোকটা না খাইয়া থাকব?

আমি কি করতাম তার? আমি কি তারে কইছি না খাইয়া থাকতে?

চৌধুরী সাহেব গেলেন আমিন ডাক্তারের কাছে। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ডাক্তার আইও আমার সাথে চাইরডা ডাইল ভাত খাও। আও দেখি আমার সাথে।

একটা মিমাংসা না হইলে কেমনে খাই চৌধুরী সাব?

কয়দিন থাকবা এই রকম? ধর যদি মিমাংসা না হয়?

যতদিন না হয় ততদিন থাকবাম।

বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। কার্তিক মাসে এ রকম বৃষ্টি হয় না কখনো। ছাতা মাথায় দিয়ে আমিন ডাক্তার উবু হয়ে বসে বসে ভিজতে লাগল। নিজাম সরকারের বিরক্তির সীমা রইল না। রাতের বেলা তাঁর জামাই আসার কথা, সে এসে যদি দেখে এমন একটা অবস্থা সেটা মোটেই ভালো হবে না। অবশ্যি মোহনগঞ্জ থানায় খবর পাঠান হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে থানাওয়ালাদের আসবার কথা। এলে ঝামেলাটা চুকে। নিজাম সরকার তামাক টানতে লাগলেন।

সন্ধ্যার আগে আগে ধীরেন্দ্র এসে হাজির। সে নাকি কি বলতে চায়। নিজাম সরকার গম্ভীর মুখে বললেন, কি কইতে চাও?

ধীরেন্দ্র হাত কচলাতে লাগল। সে একটি বিশেষ কথা বলতে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী যে তিন ভাগ মাছ ওদের প্রাপ্য সেখান থেকে সে পাঁচটা খুব বড় মাছ মতি মিয়ার কাছে পাঠাতে চায়।

নিজাম সরকার গলা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাছ দিতে চাও?

আজ্ঞে চাই।

ক্যান? কারণটা আমারে কও।

কোনো কারণ নাই, ঝামেলাটা মিটাইতে চাই।

ঝামেলা কি? আর ঝামেলা যদি থাকেই তুমি সেইটা মিটাইবার কে? তুমি কোন মাতবর?

ধীরেন্দ্র তবু নড়ে না। উসখুস করে— যাও এখন তুমি বিদায় হও।

সন্ধ্যাবেলা বহু লোকজন জংলার সামনে এসে জড় হলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। পশ্চিম আকাশে অল্প অল্প আলো হয়ে থাকায় অস্পষ্টভাবে সবকিছু নজরে আসে। থানাওয়ালাদের এসে পড়া উচিত। কেন এখনো আসছে না কেন জানে? আশাই রাত দশটার মধ্যে এসে পড়বে। কি কুৎসিত ঝামেলা।

নিজাম সরকার হঠাৎ করে ঠিক করলেন আমিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন। আর ঠিক তখনি মাছের খোলার একটি দিক আলো হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা যেতে লাগল। নিজাম সরকার দোনালা বন্দুক হাতে নিয়ে নেমে এসে শুনলেন স্থানীয় কৈবর্তরা লাঠি সড়কি নিয়ে মাছের খোলায় চড়াও হয়েছে। খুব কম হলেও দু জনের পেটে সড়কি বিঁধেছে।

রাত দশটায় মোহনগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসে আমিন ডাক্তার, নিমাই মাঝি এবং মধু খাঁকে বেঁধে নিয়ে গেল। কৈবর্ত পাড়ায় কোনো পুরুষ মানুষ পাওয়া গেল না। সব পুরুষ রাতারাতি উধাও হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে আমিন ডাক্তারকে নৌকায় তোলা হলো। ঘাটে কোনো জনমানব ছিল না।

ময়মনসিংহের সেশন জজ দুটি খুন এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার মোকদ্দমায় আসামী আমিন ডাক্তার এবং নিমাই মাঝিকে দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

সোহাগীর দিন কাটতে লাগল আগের মতোই। ঘুরে ফিরে আবার বৈশাখ মাস এল। বাধাই শিন্নির গান গেয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগল,

'আইলাম গো যাইলাম গো
বাধাই শিন্নি চাইলাম গো।'

আজরফ বিয়ে করল সুখান পুকুরে। জমি-জমা করল। চৌধুরীদের আম বাগান কিনল। ডাক্তার ফজলুল করিম সুখান পুকুরে এসে আবার দোকান ফার্মেসি খুললেন। ভালোই পসার পেলেন।

সোহাগীতে প্রাইমারি স্কুল হলো। ছাত্রের অভাবে সেই স্কুল চলল না।

সিরাজ মিয়া আবার আরেকটি বিয়ে করল। সে বৌটি আবার কয়েক দিন পর মরেও গেল। সিরাজ মিয়ার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। জমিজমা বিক্রি হতে লাগল। দিন কাটতে লাগল সোহাগীর। তারপর এক সময় আমিন ডাক্তারের কথা কারো মনেই রইল না। এগার বছর খুব দীর্ঘ সময়।

১৮

আবার কতকাল পরে ফেরা।

সববিছু কেমন অচেনা লাগে। কিছুই যেন আগের মতো নেই। নতুন নতুন রাস্তাঘাট। নতুন নতুন বাড়ি ঘর। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে আমিন ডাক্তারের চোখ ভিজে উঠল। কত পুরানো জায়গা অথচ কত অচেনা লাগছে।

মোহনগঞ্জ থেকে এখন লঞ্চ যায় নিয়তগঞ্জী, সুখান পুকুর, ঘাসপোতা। গয়নার নৌকা নাকি উঠেই গেছে। লঞ্চে চেপে হুস হাস করে লোকজন চলাফেরা করে। আমিন ডাক্তার লঞ্চের ছাদে চাদর পেতে বসে থাকে চুপচাপ। এই লঞ্চে করেই হয়তো কেউ কেউ যাচ্ছে নিয়তগঞ্জী আর সোহাগীতে অথচ কাউকেই চিনতে পারছে না।

গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছে। আমিন ডাক্তার তৃষিতের মতো তাকিয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে নদী ভরে গিয়েছে। ছেলেরা ঝাপাঝাপি করছে নতুন পানিতে। ঐ একটি নাইওরীদের নৌকা গেল। বৌটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। আমিন ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়ে। বয়স হয়ে মন অশক্ত হয়েছে, অল্পতেই চোখ ভিজে উঠে।

পেন্নাম হই। আপনে আমিন ডাক্তার না।

আমিন ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ল। কানা নিবারণ। সেই শক্ত সমর্থ শরীর আর নেই। মাথার ঝাকড় কৃষ্ণ কালো চুল আজ কাশফুলের মতো সাদা।

ডাক্তার সাব আমারে চিনছেন?

আপনেরে চিনতাম না? আপনেরে না চিনে কে?

ভগবান আপনের মঙ্গল করুক। আপনে কিন্তু ভুল কইলেন। আমারে এখন কেউ চিনে না। গলা পাই না আইজ সাত বছর। গলা দিয়া ... ব্যাঙের মতো শব্দ হয়।

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

মতি মিয়া এখন খুব বড় গাতক। চিনছেন? সোহাগীর মতি মিয়া। নয় খান সোনার মেডেল পাইছে। রেডিওতে নিয়া গেছিল। মিনিস্টার সাব তার সাথে ছবি তুলছে।

আপনে এখন করেন কি?

কিছুই করি না ভাই। পুরানা লোকজনের সাথে দেখা হইলে তারা টেকা পয়সা দিয়া সাহায্য করে। খুব অচল হইলে মতি মিয়ার কাছে যাই। আমারে খুব খাতির করে।

শরীল কেমন আপনের?

ভালা না। হাঁপানী হইছে। সারা জীবন শরীলের ওপরে অত্যাচার করছি। শরীলের আর দোষ কি?

কানা নিবারণ হোগলা পোতায় নেমে গেল। হাত ধরে নামিয়ে দিতে গেল আমিন ডাক্তার। টিকিট করা ছিল না। লঞ্চের একটা লোক কি একটা গাল দিয়ে কানা নিবারণের শার্ট চেপে ধরতেই আমিন ডাক্তার উঁচু গলায় বলল, কার সাথে বেয়াদবি কর? জান এই লোক কে? গাতক কানা নিবারণ। ইনার মতো বড় গাতক এই পিথিবীতে হয়

নাই। কয় টেকা ভাড়া হইছে, আমার কাছ থাইক্যা নেও আর ইনাম পাও বইয়া থাক চাও।

নিমতলী পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হয়ে গেল। কত পরিচিত ঘর বাড়ি। ঐ তো দখিনমুখী বট গাছ। এর নিচেই হাট বসে প্রতি বুধবার। ঐ তো উত্তর বন্দ। এমন ঘন কালো পানি অন্য কোনো হাওরে নেই। বড় মায়া লাগে।

নিমতলী থেকে একটা কেরায়া নৌকা নিল আমিন ডাক্তার। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌঁছবে সোহাগী। শক্ত বাতাস দিচ্ছে, সন্ধ্যার আগেও পৌঁছতে পারে। নৌকার মাঝি নৌকা ছেড়েই জিজ্ঞেস করল, আপনে কেডা গো? চিনা চিনা লাগে?

আমি আমিন।

আমারে চিনছেন?

না তুমি কেডা?

আমি কাদোগানের ছোড পুলা—বাদশা মিয়া। আপনের কাছে লেহা পড়া শিখছি।

পা ছুঁয়ে সালাম করল বাদশা মিয়া। অনেক খবর পাওয়া গেল তার কাছে। আজরফ একজন সম্পন্ন চাষি এখন। দুটি মেয়ে তার। বড় মেয়ের নাম আতা বানু। ইস্কুলে যায়।

ইস্কুল হইছে নাকি?

হ চাচা টিনের ঘর।

আমিন ডাক্তার চমৎকৃত হয়।

চৌধুরীর খবর কি?

দুই চৌধুরীই মারা গেছে। পাঁচ ছয় বছর হয়। বৌটা চৌধুরীবাড়িতেই আছে। মন্টি চাচার খবর কিছু হুনছেন?

কিছু কিছু শুনছি।

খুব বড় গাতক হইছে। প্রত্যেক বছর একবার কইরা আসে এই দিকে। গানের রেকর্ড হইছে মন্টি চাচার, পাঁচ টেকা কইরা দাম।

চৌধুরীর অবস্থা কেমুন এখন?

খুব খারাপ। জ্ঞাতিরা মামলা মোকদ্দমা কইরা সব শেষ কইরা দিছে।

পুত্র সন্তান তো কেউ ছিল না চৌধুরীর।

আরেকটি আশ্চর্য খবরের মতো খবর দিল বাদশা মিয়া। নিখিল সাব ডাক্তার অনুফাকে নিয়ে বিলাত চলে গেছেন। যাবার আগে অনুফাকে নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন। এক রাত ছিলেন আজরফের বাড়ি।

মাইয়াটা কি যে সুন্দর হইছে চাচা আর কি আদব লেহাজ।

ওদের বাপের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?

নাহ।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই মিনার দেওয়া সুন্দর মসজিদ চোখে পড়ল।

পাকা মসজিদ দিছে কে রে বাদশা?

সরকার সাবরুঃ দিছে। গৌলাতি অহে মসজিদের জুমার দিন মানুষের জায়গা দেওন যায় না। সুখান পুকুর বাইকাও মাইনষে নামাজ পড়তে আইয়ে।

আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে না গিয়ে চৌধুরীবাড়ি উঠল। তাকে অবাক করে দিয়ে চৌধুরীবাড়ির বৌ তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। আগের সেই কঠিন পর্দার এখন আর প্রয়োজন নেই।

ভালো আছ মা বেটি?

ভালো আছি ডাক্তার চাচা।

দীর্ঘ এগার বছর পর আবার চৌধুরীবাড়ি খেতে বসল আমিন ডাক্তার। কেউতো তাকে সারা জীবনেও এত যত্ন করে খাওয়ায়নি। বারবার চোখ ভিজে ওঠে। পান হাতে নিয়ে বৌটি আগেকার মতো মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে চাচা?

ভরছে মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।

খাওয়া দাওয়ার শেষে বাইরের জ্যোৎস্নায় এসে বসে থাকে আমিন ডাক্তার।

বৌটি এসে বসে দাওয়ায়, এক সময় মৃদু স্বরে বলে, আপনার কথা ঠিক হইছিল চাচা।

কোনো কথা?

আপনে যে কইছিলেন ওর মাথার দোষটা সারব। মরবার এক বছর আগে সত্যি সারছিল। খুব ভালো ছিল। আমারে নিয়া আষাঢ় মাসে আমার বাপের দেশে বেড়াইতে গেছিল।

বৌটি চোখ মুছে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল, আমারে নিয়ে ময়মনসিংহ গেছিল। একটি হোটেলে আছিলাম। বাইস্কোপ দেখলাম ডাক্তার চাচা। আইজ আর চৌধুরীর উপরে আমার কোনো রাগ নেই।

বৌটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কত পরিবর্তন না হয়েছে সোহাগীর। একটা দাতব্য ডাক্তার খানা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন একজন সরকারি ডাক্তার এসে বসেন। অল্প বয়েস। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেই এসেছেন। খুব নাকি ভালো ডাক্তার। এক ফোঁটা দেমাগ নেই শরীরে। গত বৎসরের বান্নাই সিন্নির সময় ছেলে পুলেদের সঙ্গে মিলে খুব নাচানাচি করেছেন।

শরিফার চলৎ শক্তি নেই। বিছানায় রাত দিন শুয়ে থাকতে হয়। অসম্ভব বুড়িয়ে গেছে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন।

আমিন ডাক্তার যখন বলল, দৌতহীন শরীরটা বড়ো শরীফা শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি আমিন, আমিন ডাক্তার।

শরিফা চিনতে পারল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাপা গলায় বলল, এরা আমারে ভাত দেয় না। আমারে না খাওয়াইয়া মারনের ইচ্ছা। আজ্জত হারামজাদারে স্কুলিসি ডাইক্যা জুতা পিটা করন দরকার। আপনে আজ্জত হারামজাদারে একটা ধমক দিয়া যান।

দেলোয়ার আপনে আমারে চিনতে পারতাছেন না?

আজরফ হারামজাদা ইন্দুর মারা বিষ কিন্যা রাখছে। পানির সাথে মিশাইয়া খাওয়াইতে চায়।

আজরফ মনে হলো' আমিন ডাক্তারকে হঠাৎ উদয় হতে দেখে ঠিক সহজ হতে পারছে না। কোথায় উঠেছে কোথায় খাচ্ছে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। নিজের বাড়িতে এসে উঠবার কথাও বলল না। থেমে থেমে বলল, সোহাগীতে থাকবেননি ডাক্তার চাচা?

আর যাইয়াম কই ক?

ডাক্তারি কইরা তো আর কামাইতে পারবেন না। সরকারি ডাক্তার আছে এখন। বালা ডাক্তার।

এখন আর কাম কাজের বয়স নাই আজরফ। শইলডা নষ্ট হইয়া গেছে।

নুরুদ্দীন লম্বা চওড়া জোয়ান হয়েছে। বাপের মতো লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত এসেছে। আমিন ডাক্তার বলল, তুইও গান গাস নাকি নুরা?

জি না চাচা।

জলধা ভিটার ঘাটে যাস?

না চাচাজি এখন আর যাই না।

আমারে লইয়া একদিন জলধা ভিটার ঘাটে যাইস।

ক্যান চাচা?

দেখনের ইচ্ছা হইছে।

এই দীর্ঘ সময়েও জলধা ভিটার ঘাটের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জায়গাটির বয়স বাড়েনি। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল সেই ডেফল গাছটি এখনো আছে। নুরুদ্দীন লগি দিয়ে ধুন্দা ঠেলছিল।

সে হালকা গলায় বলল, জলধা ভিটায় জাইট আছে চাচা।

কে কইছে?

আমার মনে হয়।

ধুন্দা এগুচ্ছে খুব ধীর গতিতে। ডেফল গাছের কাছের বাঁকটি পেরুতেই আমিন ডাক্তার বলল, এইখানে তুই একটা মেয়ে মানুষ দেখছিলি। পানির মইধ্যে ভাসতেছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি। তোর মনে আছে?

নুরুদ্দীন থেমে থেমে বলল, আছে চাচা। স্বপ্ন দেখছিলাম কিংবা চউখের ধান্দা।

নুরুদ্দীনের অস্বস্তি লাগে। ক্যাবলার মতো হাসে।

তুই ঠিকই দেখছিলি। স্বপ্ন টপ্ন না। আমি এই জিনিসটা নিয়া অনেক চিন্তা করছি। জেলখানাতে চিন্তার খুব সুবিধা আছিলরে নুরা।

নুরুদ্দীন চুপ করে রইল। আমিন ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগল। কাশি থামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, একটা কথা মন দিয়া শুন। মেয়েটার হাত ভর্তি আছিল লাল চুড়ি। হাত ভর্তি চুড়ি কোন সময় থাকে জানস নুরা?

নাহ।

যখন নতুন চুড়ি কিনে। যত দিন যায় তত চুড়ি ভাঙে আর কমে। কিছু বুঝতাছলা?

নাহ।

সোহাগীতে সেই বৎসর চুড়িওয়ালী আছিল শ্রাবণ মাসে। সব মেয়েরা চুড়ি কিনছে। তোর মাও কিনছিল।

নুরুদ্দীন ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনে কইতেছেন মেয়েডা সোহাগীর?

হ্যাঁ।

কিন্তু সোহাগীর কোনো মেয়ে তো মরে নাই চাচাজী।

মরে নাই কথাটা ঠিক না নুরা। বানের সময় সরকারবাড়ির একটা বৌ নিখোঁজ হইছিল। কত খোঁজাবুজি করল তোর মনে নাই?

আছে।

আমিন ডাক্তার চাপা স্বরে বলল, বানটা হইছিল কিন্তু জমলা ভিটার ঘটনার তিন দিন পরে।

নুরুদ্দীন লগি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহু কাল আগে পাইকর গাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা ডেকে উড়ে গিয়েছিল। আজও হঠাৎ চারদিক থেকে কাক ডাকতে লাগল। নুরুদ্দীন হাত থেকে লগি ফেলে দিল। আমিন ডাক্তার শান্ত স্বরে বলল, ভয় পাইছস নুরা?

পাইছি।

ভয়ের কিছু নাই। চল ফিরত যাই।

ফিরবার পথে আমিন ডাক্তার একটি কথাও বলল না। দক্ষিণ বান্দায় নৌকা বেঁধে দুজনে উপরে উঠে এল। আমিন ডাক্তার মৃদু স্বরে বলল, একটা খুব বড় অন্যায় হইছে সরকার বাড়িত। একটা মেয়েরে খুন কইরা জ্বালাইয়া রাখছিল জমলা ভিটাতে। বুঝতাছস তুই নুরা?

চাচা বুঝতাছি।

আমি এখন কি করবাম জানস?

নাহ।

সরকার বাড়ির সামনের ক্ষেতটাতে গিয়া বসবাম। বলবাম আপনেরা একটা বড় অন্যায় করছেন। তার বিচার চাই।

আমিন ডাক্তার হেসে উঠল।

এক অপরাহ্নে আমিন ডাক্তার তার ধূলিধূসরিত লাল কোট গায়ে দিয়ে সরকারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি ছোটখাটো কিন্তু পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে বলেই হয়তো সরকারবাড়ির সামনের প্রাচীন আমগাছ থেকে অসংখ্য কাক কা কা করে ডাকতে লাগল।

নির্ঘন্ট

যইটি : স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ কলসি। সাধারণত মাটির নিচে পুঁতা থাকে এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন (?) হয়ে থাকে। এরা নিজেরাই চলাচল করতে পারে।

খুন্দা : ঘাস কাটা ছোট নৌকা।

দোস্তাইন : বন্ধুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে ব্যবহৃত সম্মান সূচক সম্বোধন।

বাঘাই সিন্নি : নবান্ন জাতীয় উৎসব।

বারাবান্দানী : যারা ঢেঁকিতে পার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

লাশবর্শি : বোয়াল মাছ মারবার জন্যে ব্যবহৃত বর্শি। জ্যান্ত ব্যাং বা টাকি মাছের টোপ দিয়ে এই সব বর্শি সারা রাত পেতে রাখা হয়।

মাছ-খলা : মাছ শুকানোর জন্যে ব্যবহৃত উঁচু জায়গা।

ফিরাইল : শিলা বৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে এক শ্রেণীর বিশেষ মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন (?) ফকির।

ভিরাতী : ভিন দেশীয় চাষি। যার চাষ শেষ হলে ধান নিয়ে নিজ দেশে চলে যায়।

কান্দা : বাঁধ জাতীয় উঁচু জায়গা (প্রাকৃতিক)।

বন্দ : ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ। ভাটি অঞ্চলের 'বন্দ' গুলি বর্ষার হাওরে পরিণত হয়।

পাইল করা : মাছ মারা বন্ধ রাখা। সাধারণত জল-মহালগুলি দু'তিন বৎসর পাইল করার পর মাছ মারা হয়।

কেরায়া নৌকা : ভাড়া করা নৌকা।

জার : শীত। জার পড়েছে-শীত পড়েছে।

শরবিক : বয়স্ক।

জালা : বীজতলার ধান।

* * * * * * * * * * * * * * * * *